সবুজবাড়ি ও পরিবেশের গল্প



সবুজবাড়ি ও পরিবেশের গল্প

ডঃ নন্দলাল ভট্টাচার্য

নিউ পাবলিশিং কনসার্ণ
৩০/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

SABUJBARI O PARIBESHER GALPA
By Dr. Nandalal Bhattacharya

প্রকাশক ঃ
বি. চক্রবর্তী
নিউ পাবলিশিং কনসার্ণ
৩০/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ফেব্রুয়ারি—১৯৯০

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
মানস কোলে
শ্রীগুরু প্রিণ্টার্স
২৭ সূর্যসেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবুজবাড়ির আতঙ্ক



গোল বাধাল চশমাটা। সেদিন রাতে বাস থেকে নামার মুখেই পতন। চোটটা সামান্য হলেও চশমাটা একবারে ভেঙে চুরমার। চশমা ছাড়া আমি কানা। তাই সেই রাতেই ছুটলাম মিত্তিরদা'র চশমার দোকানে।

মিত্তিরদা বললেন, আপনার তো গোলমেলে পাওয়ার। কাল রাতের আগে পাবেন না।

সেটা যে আমি জানিনা, তা নয়। তবু বললাম, জানেনই তো আমার চোখের অবস্থা। তা অন্য কোন একটা চশমা যদি ধার দেন।

কথাটা শেষ করার আগেই মিত্তিরদা বলেন, আর বলতে হবে না। এক বুড়োর একটা চশমা পড়ে আছে বেশ কিছুদিন ধরে। আপনার মতই পাওয়ার। দেখুন তো হয় কিনা ?

একটু সেকেলে চশমা, চোখে কিন্তু লেগে গেল বেশ। সেটা নিয়ে ফিরলাম বাড়ি।

রাতটা ভালই কাটল। কিন্তু গোল বাধল অফিস যাওয়ার রাস্তায়। রোজকার মতই অফিসে ঢুকছি—কিন্তু সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এতদিনের দেখা শ্বেতপাথরের ভিক্টোরিয়া কষ্টিপাথরের মত কালো হয়ে গেল কি করে বুঝতে পারলাম না।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি, ছেলে বুড়ো, মেয়ে মদ্দো সবাই মুখে একটা করে গ্যাস মুখোশ এঁটে চলেছে। সবাই কেমন যেন চুপচাপ। ব্যাপার দেখে একজনকে হেঁকে জিজ্ঞেস করি, কিন্তু নির্বিকার ভাবে সে চলে যায় কোন উত্তর না দিয়েই। তারপর আরেকজনকে—আরো—আরো অনেককে। কিন্তু কেউ যেন আমার কথা শুনছেই না। অবাক

হয়ে দেখি, প্রত্যেকের কানেই রয়েছে হিয়ারিং এড যন্ত্র, কিন্তু কেউ কোন কথা বলছে না। ইশারাতেই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। চারিদিকে যেন ধুলোর ঝড় উঠেছে তাতে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে বেশ—হাঁচিও আসছে।

চারদিকের এত বোবাকালা মানুষ দেখে ভয়ে অফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সেখানেও দেখি আমার চেনা কেউ নেই—সব অন্য লোক। পৃথিবীর যে বিরাট মানচিত্রটা সামনে রেখে এতদিন কাজ করেছি তার জায়গায় নতুন একটা মানচিত্র টাঙানো রয়েছে। তাতে তিন ভাগের জায়গার প্রায় পৌনে চারভাগই জল—বাকিটা স্থল।

কিছুই বুঝতে পারি না। ভয় পেয়েই বাইরের দিকে তাকাই। সারা পৃথিবীটাকেই তখন আমি দেখতে পাচ্ছি। সময় দ্রুত এগিয়ে চলেছে। দু-হাজার সাল পার হয়ে গেছে কবে। ২০৯৯ সালের শেষ দিক। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠছে। তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্র তীরের একটার পর একটা দেশ, শহর, বন্দর।

ঘামতে শুরু করেছি ততক্ষণে। ভয় পেয়ে চশমাটা খুলে মুখ মুছে তাকাই। দেখি, সব যেমনকার তেমনি আছে। সেই পুরনো সহ-কর্মীদের মধ্যেই কাজ করছি আমি।

আশ্বস্ত হয়ে চশমাটা পড়ি। আবার সেই অবস্থা। পৃথিবীর বয়স বাড়ছে—মহাপ্রলয়ও গ্রাস করছে তাকে।

চশমা খুলি, পরি। বুঝতে পারি যাদুচশমা এটা। এটা পড়লেই আগামী দিনের পৃথিবীটাকে দেখা যায়। কিন্তু আগামী দিনের পৃথিবী কি এত ছোট হয়ে যাবে? মানুষজন হবে বোবা কালা?

ভয়ে আতঙ্কে কোনরকমে অফিস্ করে সোজা মিত্তিরদার দোকানে। চশমাটা খুলে দিয়েই বলি এই নিন আপনার চশমা—একেবারে পাগলা করে দিল।

কথাটা শেষ হবার আগেই কে যেন হেসে উঠল। তাকিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ। মিত্তিরদা বললেন, এঁরই চশমা। এতদিন বাদে নিতে এসেছেন। দিন ওটা। আর এই নিন, আপনারটা তৈরি হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ বলেন, খুব ভয় পেয়েছেন তো? পাবারই কথা। সত্যি সত্যি বছর সত্তরের মধ্যে পৃথিবীর অনেকটাই তলিয়ে যাবে মহাসমুদ্রের মধ্যে। শব্দের দাপটে মানুষ হয়ে যাবে কালা। কানে শুনতে না পাওয়ার জন্য কথা বলার ইচ্ছেটাকেও ফেলবে হারিয়ে। পৃথিবীটাকে

এমন করে সবুজ বাড়ি মানে গ্রিন হাউস করে তুলবেন না। এখনও সময় আছে সাবধান।

বিরাট এক চেতাবাণী দিয়ে যেন মিলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। মহাপ্রলয়ের আশঙ্কায় আমি তখনও কাঁপছি থরথর করে।

এই পর্যন্ত বলে ছোটকা একটু থামতেই মুন্নি, বিল্টু, বুড়ি, বুবুল একবারে হৈহৈ করে ওঠে। বুবুলই ওদের মধ্যে একটু বড়। তাই চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, বেশ কল্পবিজ্ঞানের একটা গল্প বললে ছোটকা।

মুন্নি বলে, ছোটকা, এটা তাহলে সত্যি নয়, গল্প।

ছোটকা বলে, দেখ এটা তোদের কল্পবিজ্ঞানের গল্প মনে হতে পারে। কিন্তু এটা গল্প নয় সত্যি। সত্যি সত্যি এই ধরনের আশঙ্কার কথা শুনিয়েছেন বিশ্বের বিজ্ঞানীরা বেশ কয়েক বছর আগে।

১৯৮৫ সালের অক্টোবর। অস্ট্রিয়ার ভিলাক শহরে জড়ো হলেন বিশ্বখ্যাত ৫০ জন বিজ্ঞানী। পরিবেশ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁরা বললেন, 'গ্রিন হাউস এফেক্টে'র দরুন পৃথিবীর তাপমাত্রায় এখনই অনেক হেরফের হয়ে গেছে। উত্তর গোলার্ধের আবহাওয়ায় উত্তাপ বাড়ছে সেই হারে। ফলে সেখানকার বরফ গলতে শুরু করেছে। তাঁরা হিসেব-নিকেশ করে জানান, আগামী শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ সমুদ্রতল আরো দেড় মিটার উঠে আসবে, তাতে আগামী শতাব্দীর শেষেই তলিয়ে যাবে পৃথিবীর অনেকটাই। এখনই সমুদ্রের জল বেড়েছে ৩০ সেণ্টিমিটারের মত। গত শতকেও সমুদ্রের জল বাড়ার হার ছিল প্রতি দশকে ·০১ মিটার কিন্তু এখন সে হার ৫ থেকে ২৫ গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে। অতএব সাবধান। খোদার ওপর খোদকারি করতে গিয়ে মহাপ্রলয়কে ডেকে আনবেন না। 'মানুষ মানুষের জন্য' বলে শুধু গান না বেঁধে পৃথিবীকে 'গ্রিন হাউস' করা থেকে বিরত হবার রাস্তা নিন—রাস্তা দেখান।

ছোটকা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে বুবুল বলে, ছোটকা, এই গ্রিন হাউস বা সবুজ বাড়িটা কি?

শীতের দেশে, বিশেষ করে যেখানে বরফ জমে থাকে অনেদিক ধরে, সেখানে সবজি চাষের জন্য বিজ্ঞানীরা আশ্রয় নিয়েছেন এই পদ্ধতির। আগাগোড়া কাঁচের তৈরি একটা ঘর। মাটি বলতে শুধু মেঝেটা, অবরুদ্ধ সেই কাঁচের ঘরে নিয়মিত সেচ দিয়ে মাটিতে বোনা হচ্ছে

সবজী। বাইরের হিমেল হাওয়া ঢুকতে পারছে না ভেতরে। শ্বাস প্রশ্বাসের দরুন শাক-সবজি থেকে বেরিয়ে আসা কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরোবার রাস্তা না পেয়ে ভারি করে তুলেছে কাঁচের ঘরের আবহাওয়া। প্রস্বেদনের জন্য শাক-সবজি থেকে বেরিয়ে আসা জলকণায় ভেতরের বাতাস হয় আরো আর্দ্র। তাছাড়া সেচের জল তো আছেই। ওদিকে সূর্যের উত্তাপবাহী অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রা-রেড কাঁচের দেওয়াল ভেদ করে ঢুকছে ভেতরে। মাটি, গাছপালা শোষণ করছে সে উত্তাপ। আপাতিত রশ্মির পরিত্যক্ত অংশ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় আবার আকাশে। কিন্তু সবুজ বাড়ির ভারি কার্বন ডাইঅক্সাইডের স্তর সে রশ্মির ফেরার পথ দিচ্ছে বন্ধ করে। ফলে ঘরের উত্তাপ বাড়ছে আরো। তাই বাইরে শীতল পরিবেশ থাকলেও সবুজ ঘরের ভেতরটা বেশ গরম, ফলে চাষও হয় বেশ ভালই।

মুন্নি বলে, এটা তো বেশ মজার ব্যাপার। কায়দা করে বরফের দেশেও বেশ ফসল ফলান যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনে পৃথিবীটাই এখন সবুজ বাড়ি হয়ে উঠছে। আগে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হত কাঠ। তাতে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নানারকম হাইড্রোকার্বন যৌগ, সামান্য কার্বন মনোক্সাইড এবং জলীয় বাষ্পের উদ্ভব হত তার অনেকটাই শোষণ করত দেশের বনভূমি, মহাসাগর, নদীনালার জল। ফলে আবহাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা তেমন বাড়তে পারত না।

কিন্তু এখন রান্নাঘর থেকে কলকারখানা সর্বত্রই কাঠের বদলে জ্বালানির জায়গা নিয়েছে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম। তারওপর মোটর, লরি, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ইত্যাদি চালাতেও ব্যবহার করা হয় পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা। আর এইসব জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইড, হাইড্রোকার্বন গ্যাসের মাত্রা গত ৫০ বছরে বেড়েছে আতঙ্কজনকভাবে। ওদিকে আবাদ, বসতের জন্য যথেচ্ছ বৃক্ষনিধনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের মাত্রাটাও কমছে।

আবার জমিতে নাইট্রোজেন সারের ব্যবহারের ফলে নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা বেড়েছে বাতাসে। পচা গাছগাছালি বাড়াচ্ছে

হাইড্রোকার্বন। গরু মোষের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা হাইড্রোকার্বন এই মাত্রাকে দিয়েছে আরো বাড়িয়ে। পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলকে এই গ্যাস করে তুলেছে ভারি। অবলোহিত রশ্মির বিকীর্ণ আলো আকাশে ফেরার পথে এই স্তরেই হচ্ছে শোষিত, ফলে আবহাওয়ামণ্ডল হচ্ছে তপ্ত।

ওদিকে ঊর্ধ্বাকাশে রয়েছে যে ওজোনের স্তর—যে স্তর প্রতিহত করে প্রাণী এবং উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর সূর্যের অতি-বেগুনি রশ্মি বা আলট্রা ভায়লেট রে-কে, সেই স্তরও হারাচ্ছে ভারসাম্য। ফ্রিজ, হিমঘর, ফোম, রঙের স্প্রে ইত্যাদি তৈরিতে যে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন ব্যবহার করা হচ্ছে ঊর্ধ্বাকাশে তার সঙ্গে ওজোনের বিক্রিয়ায় ওজোন স্তর হয়ে উঠছে হাল্কা। ফলে ভূপৃষ্ঠে অতি বেগুনি রশ্মির মাত্রা যেমন বেশি পরিমাণে এসে পড়ছে তেমনি স্তর হাল্কা হওয়ায় ওজোন আর আগের মত অবলোহিত রশ্মিকে শোষণ করতে পারছে না। ফল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি।

জমিতে ব্যবহৃত নাইট্রোজেন কোন কোন অঞ্চলের আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রাকে দিয়েছে বাড়িয়ে। এই নাইট্রোজেন অক্সাইডের সঙ্গে সঙ্গে রশ্মির বিক্রিয়ায় আবহাওয়ামণ্ডলের অক্সিজেন অণু পরিণত হচ্ছে ওজোনে। আবহাওয়া পরিমণ্ডলের প্রথম স্তরে ওজোনের মাত্রা বাড়ায় ক্ষতি হচ্ছে গাছপালা এবং প্রাণীজগতের।

বিজ্ঞানীরা বললেন, গত লক্ষ বছর ধরে আবহাওয়ামণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্র মোটামুটি এক থাকলেও, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিআধুনিক প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জ্বালানির অতি ব্যবহার, যথেষ্ট বৃক্ষনিধনের ফলে এই শতকের গোড়া থেকে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বেড়েই চলেছে, বেড়েছে মিথেনের মাত্রাও। আর এইসবই আবহাওয়ামণ্ডলকে করছে উত্তপ্ত, তাতে প্রসার ঘটছে মরু অঞ্চলের, খরা দেখা দিচ্ছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। এরই ফলে আবার দেখা যাচ্ছে ধুলো ঝড় ইত্যাদি। আর এ সব কিছুই ডেকে আনছে মহাপ্রলয়কে।



বাতাসে বিষ

ছোটকার ওই শেষ কথা, 'এসবই ডেকে আনছে মহাপ্রলয়কে' যেন ভারি করে তোলে বাতাসকে। মুন্নি, বিল্টু, বুড়ি, বুবুল সবাই চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ।

সেই ভারি ভাবটা কাটাবার জন্যই ছোটকা এবার একটু হাল্কা সুরে বলেন, কিরে চুপ করে গেলি কেন সবাই ? মহাপ্রলয়ের কথায় খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে ?

মুন্নি বলে, আচ্ছা ছোটকা, সত্যি যদি মহাপ্রলয় হয়, মানে সমুদ্রের জলে যদি চারিদিক ভেসে যায় তাহলে আমাদের কি হবে ?

বিল্টু বলে, কি আবার হবে ? সেই নোয়ার নৌকো আসবে, আর তাতেই আমরা চেপে বসব।

বুড়ি বলে, নোয়ার নৌকো কি, বল লোহার নৌকো।

বিল্টু সঙ্গে সঙ্গে ভেংচি কেটে বলে, পাকাবুড়ি, কিছু জানে না, সব কিছুতেই নাক গলানো চাই। লোহা নয়, ওটা নোয়ারই নৌকো। কেন বাইবেল পড়িসনি।

না, আমাদের ওসব পড়ায় না। তাছাড়া বাইবেলের সঙ্গে নৌকোর কি সম্পর্ক ?

আছে। বাইবেলে আছে, পৃথিবীতে যখন মহাপ্রলয় আসে তখন নোয়া তার নৌকোতে মানুষ থেকে শুরু করে সব রকম প্রাণী, গাছপালা ইত্যাদি একটা-দুটো করে নৌকোতে তুলে নেয়। প্রলয় থামতে সেসব থেকেই শুরু হয় আবার নতুন সৃষ্টি।

বুড়ি এবার বলে, ও, তাই বল। তাহলে আমরাই তো সে নৌকোয় উঠব, তাই না ছোটকা।

হ্যাঁ, তোর মত বুড়িকে নৌকোয় নিতে বয়ে গেছে নোয়ার।

বিল্টুর কথায় রেগে গিয়ে বুড়ি বলে, আমাকে নেবে না, তবে বুঝি তোকেই নেবে।

নেবেই তো।

বয়ে গেছে।

বুড়ি আর বিল্টুর মধ্যে প্রায় মারামারি লেগে যায় দেখে ছোটকা বলে, এমন করলে কিন্তু আমি আর গল্প বলব না।

ওই একটি কথাতেই কাজ হয়। ওরা দুজনেই আবার ভাব করে বলে, না ছোটকা, তুমি বল।

বুবুল এতক্ষণ চুপচাপ সব শুনছিল। এবার বলে, আচ্ছা, ছোটকা, তুমি এতক্ষণ যেসব কথা বললে, তার থেকে বুঝলাম—নানারকম নোংরা জিনিসপত্রে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে বলে সূর্যের কিরণ পৃথিবী থেকে ঠিকমত ফিরে যেতে পারছে না। তার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া গরম হয়ে উঠেছে—মেরু প্রদেশের বরফ গলছে, তাতে সমুদ্রের জল বাড়ছে। এইভাবে জল বাড়লে একদিন হয়তো সারা পৃথিবীটাই তলিয়ে যাবে জলের তলায়। এইতো?

হ্যাঁ।

কিন্তু ছোটকা, এটা তো অনেক পরের ব্যাপার। কিন্তু এইভাবে বাতাস যে নোংরা হচ্ছে, তাতে এখন আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে না?

হচ্ছে না আবার? একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? যাদবপুর থেকে উল্টাডাঙ্গায় আসছিস। নয় নম্বর বাসের দোতালায় জানলার ধারে একটা সিট পেয়ে বেশ আরাম করে ঘুমোতে শুরু করে দিয়েছিস। কোথা দিয়ে যে সময় চলে যাচ্ছে তার খেয়ালও নেই। কিন্তু যেই অরবিন্দ সেতুর ওপর বাসটা উঠল তখনই তোর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তুই বেশ খুক খুক করে কাশতে শুরু করলি। তারপর দেখলি, তুই একা নয়, অনেকেই কাশছে। আর এটা একদিন নয়, রোজকার ব্যাপার।

ঠিক বলেছ ছোটকা। অরবিন্দ সেতুতে বাস ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি গলা খুসখুস করে, চোখ দুটো কেমন যেন জ্বালা-জ্বালা করে। এমন কেন হয় বলতো ছোটকা?

এর কারণ, উল্টোডাঙ্গার ওই অঞ্চলটাতে বাতাসের মধ্যে প্রচুর ধুলো-বালি ময়লা রয়েছে। আশেপাশে রয়েছে অ্যাসিডের কারখানা। সেই অ্যাসিডও মিশছে বাতাসে—আর তাতেই চোখজ্বালা, গলা খুসখুস।

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসের এইসব ময়লা বা গ্যাসে গলা খুসখুস বা চোখজ্বালা করা ছাড়া আর কিছু হয় না তো ?

হয় না আবার। শহরে আর যেসব অঞ্চলে নানারকম কলকারখানা আছে, সেখানকার বাতাস গ্রামের বা যেখানে অনেক গাছপালা আছে তার চেয়ে অনেক খারাপ। তাই শহরে বা শিল্পাঞ্চলের মানুষের প্রায়ই শ্বাসকষ্ট, মাথাধরা, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ভুগতে হয়। আর কোন কারণে একবার যদি বাতাসে ওই জাতীয় বিষাক্ত গ্যাসের মাত্রা বেড়ে যায় তাহলে মানুষ মারা পর্যন্ত যায়।

ভোপালে তো তাই হয়েছিল, না ছোটকা ?

হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। ১৯৮৪ সালে ২ ডিসেম্বর রাতে ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের কারখানা থেকে গ্যাস বেরিয়ে সেখানকার বাতাসকে এমন বিষাক্ত করে তোলে যে তাতে তিন হাজারের বেশি মানুষ মারা যায়। আর বেঁচে থেকেও একেবারে অকেজো হয়ে গেছে আরো ৫০ হাজার মানুষ। বলতে পারিস, মানুষের ইতিহাসে এতবড় শিল্প-দুর্ঘটনা এর আগে আর কখনো ঘটেনি।

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসে হঠাৎ করে এই ধরনের বিষাক্ত গ্যাস মেশা ছাড়া অন্য কোন ঘটনায় এমনভাবে দম নিতে না পেরে মানুষ কি মারা গেছে ?

কেন যাবে না। এ ধরনের অনেক ঘটনাই ঘটছে। তবে এসব বেশি ঘটেছে ইউরোপ বা আমেরিকার দেশগুলোতে। ওই সব দেশে ঠাণ্ডা অনেক বেশি বলে বাতাস সব সময়ই একটু ভারি। তার ওপর ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য এসব দেশের মানুষ অনেক বেশি আগুন জ্বালে। ঘর গরম করার জন্য ফায়ারপ্লেসে দিনরাত কাঠ আর কয়লা পুড়ে বাতাসে ধোঁয়া ছাড়ে। ওই ধোঁয়া আর ময়লা মিলে কুয়াশার মত সৃষ্টি করে ধোঁয়াশা। আর এই ধোঁয়াশা-তে দুর্ঘটনা ঘটার খবর আকছাড়ই পাওয়া যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালে লণ্ডনে যা হয়েছিল তার মত শোচনীয় ঘটনার নজির আজও নেই।

এ যে ভয়ানক ব্যাপার ছোটকা। ব্যাপারটা কি হয়েছিল একটু বলবে ?

কেন বলব না, এগুলো তো তোদেরই জেনে রাখা উচিত। এসব জানলে পরে তোরা অনেক সচেতন হবি আর তোরা সচেতন হয়ে ব্যবস্থা নিতে থাকলেই হবে আসল কাজ।

তুমি কিন্তু ইংলণ্ডের গল্পটা না বলে অন্য কথা বলছ ছোটকা।

বলছি মুন্নি, বলছি। আগেই বলেছি সেটা হল ১৯৫২ সালের কথা। ডিসেম্বরের ৩ তারিখ। লণ্ডনের বুকে সেটা ছিল অসম্ভব আলো ঝলমলে একটা শীতের দিন। আগের রাতেই শেষ শীতের প্রবাহটা চলে গেছে। উত্তর দিক থেকে বইতে শুরু করেছে যেন বসন্তের হাওয়া। দুপুর নাগাদ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিকে ছাড়িয়ে গেল। হাওয়ার আর্দ্রতার ভাগও প্রায় ৭০ শতাংশের মত। নীল আকাশ জুড়ে দেখা দিয়েছে সাদা হাল্কা মেঘ। আবহাওয়ার ওই রূপ দেখে সারা লণ্ডন যেন নেমে পড়ল রাস্তায়। জোয়ান, বুড়ো, বাচ্চাকাচ্চার কোলাহলে লণ্ডনের রাস্তা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠল।

কিন্তু এটা ছিল মাত্র একদিনের আনন্দ। পরদিনই সব কিছু যেন পাল্টে যেতে থাকল। ব্যারোমিটারের পারা তরতর করে নামতে থাকল। বাতাসে আর্দ্রতাও বাড়তে থাকে। আকাশ জুড়ে ঘন ধূসর মেঘের আনাগোনা। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। সমস্ত কলকারখানা আর বাড়ির চিমনি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া, সেই সঙ্গে ছাই আর সালফার ডাই-অক্সাইডের মত নানা ক্ষতিকর গ্যাস।

আচ্ছা ছোটকা, একটু আগে তুমি ওই যে ব্যারোমিটারের কথা বললে ওটা কী ?

বুড়ির এক কথায় ছোটকা বলে, আচ্ছা বুড়ি, তোর জ্বর হলে তোর মা কি করে তোর জ্বর মাপে ?

কেন, থার্মোমিটার দিয়ে। বগলে থার্মোমিটারটা দিয়ে রাখে খানিকক্ষণ, আর তারপর গম্ভীর সুরে বলে, বুড়ি, তোমার টেম্পারেচার এখন ৯৯। একদম নড়াচড়া করবে না—চুপচাপ শুয়ে থাকবে।

ঠিক। তাহলে তুই থার্মোমিটার দেখেছিস তো। ব্যারোমিটারকে বলতে পারিস ওই থার্মোমিটারের বড়দা। থার্মোমিটার দিয়ে যেমন মানুষের গায়ের উত্তাপ দেখা হয়, ব্যারোমিটার দিয়ে তেমনি দেখা হয় আমাদের চারপাশের আবহাওয়ার উত্তাপ—বুঝলি।

মুন্নি বলে, হ্যাঁ। তুমি এখন লণ্ডনের যে গল্পটা বলছিলে সেটাই বল।

ওটা গল্প নয় রে, সত্যিকারের ঘটনা।

ওই একই হল ছোটকা। তুমি বল তো।

শোন তবে, দুদিনের মধ্যেই মানে ৬ ডিসেম্বর অবস্থা হল আরো সঙ্গিন। ঘন কুয়াশায় ভরে গেল চারিদিক। এত কুয়াশা যে একহাত দূরের মানুষকেও দেখা যায় না। কুয়াশার জন্য আকাশে প্লেন উড়ল না, রাস্তায় মোটরগাড়ি চলল না। বাতাসে আর্দ্রতা শতকরা একশ ভাগ হয়ে গেল, তাপমাত্রা নেমে এল শূন্য ডিগ্রির নিচে। সমস্ত লণ্ডন শহরটা যেন মড়ার শহর হয়ে গেল। সবাই বাড়িতে খিল এঁটে বসে রইল আর যাদের নেহাৎই বেরোতে হল তারা ফুসফুসকে বাঁচাতে সার্জিক্যাল মুখোশ পরে নিল।

ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে প্রতিটি বাড়ির ফায়ার প্লেসে জ্বলতে থাকল গনগনে আগুন। স্টোভ, ফার্নেস সবকিছু একসঙ্গে জ্বলতে থাকে। আর এতে যা হবার তাই হল। বাতাস ভরে যেতে থাকল নানা রকম বিষাক্ত গ্যাসে, ছাই এবং অন্যসব সূক্ষ্ম কণায়। আর বাতাসের ওইসব জঞ্জাল—লক্ষ কোটি সেনার মত একসঙ্গে আক্রমণ করতে থাকল প্রতিটি মানুষ, জীবজন্তুকে।

বাতাসের ওই গ্যাস এবং নোংরা ছাই জঞ্জালে সবার চোখ জ্বালা করতে থাকল, গলা খুসখুস করতে থাকল। দলে দলে মানুষ অসুস্থ হয়ে হাসপালে ভর্তি হতে থাকল। তাতেও কিন্তু রেহাই পাওয়া গেল না। হাসপাতালে বাড়তে থাকল মৃত্যু সংখ্যা।

সেবারের সেই প্রচণ্ড শীতপ্রবাহ ১০ ডিসেম্বর লণ্ডনের ওপর দিয়ে চলে গেল। মানুষ আবার স্বস্তির নিশ্বাস নিতে পারল।

কিন্তু এই ক'দিনের শীত, ধোঁয়াশা আর বাতাসের জঞ্জালে কত লোক মারা গেল জানিস? ওই ক'দিনের ধোঁয়াশার প্রত্যক্ষ বলি হল চার হাজার মানুষ আর পরের দু মাসে বিষিয়ে ওঠা বাতাস নিশ্বাসে নিয়ে দীর্ঘ অসুস্থতার মধ্যে মারা গেল আরো আট হাজার মানুষ।

তুমি বলছ কি ছোটকা, বাতাসে ধোঁয়া আর ময়লা মিশে এমন কাণ্ড করতে পারে?

পারে বই কি বিল্টু। সেই জন্যই তো দুনিয়া জুড়ে আজ প্রতিটি জায়গায় মানুষ বাতাসকে বিশুদ্ধ রাখার কথা বলছে। কোনরকমভাবে বাতাসে যাতে ক্ষতিকর কোনকিছু জমতে না পারে তার জন্য সবাইকে হুঁশিয়ার করা হচ্ছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘ পর্যন্ত ৫ জুন তারিখটাকে পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

কিন্তু ছোটকা, তুমি লণ্ডনের এই যে ঘটনাটার কথা বললে, এটা তো নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা—একবার ঘটে গেছে। এর জন্য ভয় পাওয়ার কি আছে ?

আছে বুবুল, ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। তাছাড়া এটা কোন জায়গায় হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া একবারের ঘটনা নয়। এই লণ্ডনের কথাই ধর না কেন, ১৯৫২ সালের ওই ঘটনার চারবছর বাদে অর্থাৎ ১৯৫৬ সালেই সেখানে ঘটল প্রায় একই ধরনের ঘটনা। সেবার লণ্ডনে মারা যায় এক হাজার মানুষ। ১৯৬২ সালেও সেখানে চারশ লোক মারা যায় এই বায়ু দূষণের জন্য।

লণ্ডনের মত নিউইয়র্কেও ১৯৫৩ সালে এই ধোঁয়াশায় মারা যায় দুশ'রও বেশি মানুষ। ১৯৬৩ এবং ১৯৬৬ সালেও একই কারণে সেখানে মারা যায় যথাক্রমে দু'শ এবং ১৬৮ জন।

আচ্ছা ছোটকা, তুমি এই যে লণ্ডন কিংবা নিউইয়র্কের কথা বললে, তার একটা ব্যাপার কিন্তু বুঝতে পারি না।

বল, কোনটা তোর বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে ?

সেকথায় বুবুল বলতে থাকে, ছোটকা, লণ্ডনই বল, আর নিউইয়র্কই বল, এগুলো তো শীতের দেশ। সেখানকার মানুষ তো চিরকালই ঘরে বাইরে এইভাবে আগুন জেবলে সবকিছু গরম রাখার চেষ্টা করে। এই ধরনের আগুন জ্বালার জন্য বাতাসে বিষাক্ত গ্যাস এবং নানা ময়লা জিনিস জমা হওয়ার ঘটনাও নতুন নয়। এসবের মধ্যেই সেখানকার মানুষ বেঁচেও থাকে। তাহলে হঠাৎ হঠাৎ করে এমন দুর্ঘটনা কেন ঘটে ?

দেখ বুবুল, তুই যা বললি তা সত্যি। কিন্তু ব্যাপারটা কি হয় জানিস। প্রথমত ওই সময় বাড়িঘর এবং কলকারখানায় স্বাভাবিকের অনেক বেশি আগুন জ্বলে বলে ধোঁয়া, ছাই এবং অন্যান্য ময়লাও অনেক বেশি বাতাসে মেশে। তাছাড়া, ওই সময় তাপমাত্রার একটা উল্টো ব্যাপারটাও চলতে থাকে। আর তারই ফলে তৈরি হয় ওই ধরনের অস্বাভাবিক অবস্থার।

ছোটকা, তুমি যে বললে, আবহাওয়ার উল্টো ব্যাপার—তা জিনিসটা কি একটু বলবে ?

নিশ্চয়ই বলব। তোরা তো প্লেনে চড়েছিস।

হ্যাঁ, সেবার গুয়াহাটি গিয়েছিলাম আমরা প্লেনে চেপেই।

গুড। এখন প্লেনের দরজাজানলা সব বন্ধ থাকে বলে তোরা বুঝতে পারিসনি, কিন্তু ব্যাপারটা জেনে রাখ, প্লেন যত ওপরের দিকে উঠবে বাইরে তাপমাত্রা তত কম হবে।

এই সঙ্গে আরো একটা ব্যাপার জেনে রাখ, বাতাস গরম হলেই সেটা হাল্কা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়।

মুন্নি এবার বলে ওঠে, হ্যাঁ, ভূগোলে পড়েছি, গরম কালে রোদ্দুরের তেজে বাতাস গরম হয়ে হাল্কা হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায় আর সেই ফাঁকা জায়গা ভরাট করতে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসে আর তার ফলেই ঝড় হয়।

হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছিস। দেখবি এই জন্যই কোন জায়গায় আগুন লাগলে সে জায়গায় বেশ জোরে বাতাস বইতে থাকে। কেন বলতো ?

বুড়ি বলে, কেন আবার, যেখানে আগুন লাগে সেখানকার বাতাস গরমে বেড়ে হাল্কা হয়ে ওপুরে উঠে যায় আর আশপাশ এলাকা থেকে ঠাণ্ডা বাতাস সেখানে আসে বলে।

ভেরিগুড। গরম বাতাস ওপরে উঠে গিয়ে আবার চাপের জন্য সংকুচিত হয় এবং সেই অবস্থাতে ওপরের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে মিশে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। বাতাস যখন গরম হয়ে ওপরের দিকে উঠে যায়, তখন কিন্তু তা অন্য সব কিছুর সঙ্গে বেশ কিছু দূষিত জিনিসও নিয়ে যায়। এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু এক আধ সময় ব্যাপারটা একটু অন্য রকম হয়ে যায়।

কি রকম ?

বলছি মুন্নি, অত তাড়া লাগাস না। এখন কোন কোন সময় কি হয় জানিস। গরম বাতাস ওপরে উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা এলাকায় চলে গেল। কিন্তু, গরম বাতাস অনেক হাল্কা বলে, তা ওই ঠাণ্ডা ভারি অঞ্চলটাতে না থেকে আরো ওপরে উঠে গেল। এখন এই ব্যাপারটাকেই বলা হয় ইনভারসন বা উল্টো ব্যাপার। বায়ুমণ্ডলের এই ধরনের অবস্থাটা বেশ স্থিতিশীল এবং বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত এটা চলতে পারে। এই অবস্থাতে দূষণযুক্ত গরম হাওয়া যখন আমাদের এই পৃথিবীর কাছাকাছি ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্য দিয়ে ওপরে গিয়ে সেই গরম হাওয়ার সঙ্গে মেলে

তখন সেটা আর তার আশপাশের হাওয়ার চেয়ে হাল্কা থাকে না। এই নতুন গরম হাওয়াটা আসলে নিচের ঠাণ্ডা হাওয়া আর ওপরের গরম হাওয়ার মধ্যে আটক পড়ে যায়। ফাঁদে আটকে পড়ে গিয়ে এই হাওয়া আবার নিচেই ফিরে আসে। ফিরে আসার সময় কিন্তু বয়ে নিয়ে আসে আকাশের সব আবর্জনাকে।

আরো একটা ব্যাপার ঘটে অনেক সময়। যখন আবহাওয়ায় এই উল্টো ব্যাপারটা থাকে, তখন ধোঁয়াশাকে বয়ে নিয়ে যাবার মত খুব বেশি বাতাস থাকে না। বাতাস বয় না বলেই বাতাসের দূষিত পদার্থগুলিকেও ওপরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বাড়তেই থাকে। যতক্ষণ না আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ এই অবস্থাটা চলতেই থাকে। আর ওই অবস্থাটা বেশি দিন চললেই ঘনিয়ে আসে বিপদ।

এ বিপদ থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোন রাস্তা নেই ?

কেন থাকবে না বুবুল। সে রাস্তা হচ্ছে, বাতাস বেশিমাত্রায় দূষিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই তাকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া।

সেটা কিরকম ?

দেখ, যেদিন আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা আগুন জ্বালতে শিখল, সেদিন থেকেই শুরু হল মানব সভ্যতার ইতিহাস। কথাটা সত্যি। কিন্তু ঐ সত্যি কথার সঙ্গে আরেকটা কথা আমরা বলি না, সেটা হল, যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালতে শিখল সেদিন থেকেই শুরু হল মানুষের আয়ু কমাবার মারণ যজ্ঞ।

তোমার কথা কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না ছোটকা। আগুন জ্বালতে শেখার সঙ্গে মানুষের আয়ু কমার সম্পর্কটা কি ?

মুন্নির কথা শেষ হবার আগেই বিল্টু বেশ ভারিক্কি চালে বলে, এই কথাটা তুই বুঝতে পারলি না মুন্নি—তুই কি বোকারে !

তার মানে ?

তার মানে মানুষ যেদিন আগুন জ্বালতে শিখল তারপর থেকেই ঘরবাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে মরাও শুরু হল। তাই না ছোটকা ?

না বিল্টু, আমি মোটেই সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি, আগুন জ্বালতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে মিশতে থাকল ছাই, আর

যা জ্বালানো হচ্ছে তার থেকে বেরিয়ে আসা নানা ক্ষতিকর গ্যাস। তার ফলেই বাতাস দূষিত হয়ে উঠতে থাকল—আর ঐ দূষিত বাতাস যে মানুষের কি ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে তা তোদের একটু আগেই বললাম।

মুন্নি এবার বিল্টুকে নিয়ে পড়ে। বলে, দেখ বিল্টু, তোকে দেখেই মাস্টারমশাই সেদিন বলেছিলেন, ফাঁকা কলসি—বাজে একটু বেশি। জানবি না, শুনবি না সবকিছুতেই ফটফট করে তোর কিছু বলা চাই-ই।

মুন্নির কথায় বিল্টু তেড়ে উঠতেই তাকে থামিয়ে বুবুল বলে, ছোটকা, তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, মানুষ যেদিন আগুন জ্বালতে শিখল সেদিন থেকেই বায়ুদূষণ শুরু হয়েছে।

হ্যাঁ, সেদিন থেকেই বাতাসে মানুষ বা অন্যান্য জীব-জন্তুর পক্ষে ক্ষতিকারক গ্যাস বা অন্যান্য আবর্জনা হাওয়ায় মিশতে থাকে। আর তাতে ফল যা হবার তাই হচ্ছে।

কিন্তু ছোটকা, বুবুল যেন বেশ চিন্তিত ভাবেই বলে, ব্যাপারটা যদি তাই হবে, তাহলে মানুষ এতদিন এর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি কেন? এখনই বা একে নিয়ে তারা এত হৈ চৈ করছে কেন?

হৈ চৈ করার কারণ, বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকায় এবং তার ফলে নানারকমের রোগের উপসর্গ দেখা দেওয়াতেই সবার এত চিৎকার, চেঁচামেচি। আগের আগের যুগে বাতাসে দূষিত পদার্থ মিশলেও, মানুষের জীবন বিপন্ন করার মত আশঙ্কা দেখা দিত না বলেই চেঁচামেচি হত না।

তাহলে বাতাসে এইসব ক্ষতিকর পদার্থের পরিমাণ কবে থেকে বাড়তে থাকল?

মুন্নির এই প্রশ্নের জবাবে হঠাৎই ছোটকা বলেন, মুন্নি, তোকে যে রুপোর পাঁয়জোরটি দিয়েছিলাম সেটা নিয়ে আয়তো রে। মুন্নি তাড়াতাড়ি তার রুপোর পায়জোড়টি নিয়ে আসে। ছোটকা সেটি হাতে নিয়ে বলে, আচ্ছা মুন্নি, তোকে যখন এটা দিয়েছিলাম, তখনও কি রুপোর রঙ এমনই ছিল?

তা কেন থাকবে। তখন বেশ চকচকে ছিল এটা। কিছুদিন পরেই ময়লা হয়ে যায়। সাবান জল আরও কি সব দিয়ে মা পরিষ্কার করে দিয়েছিল। আবার দেখছি এটা ময়লা হয়ে গেছে।

রূপোর জিনিস এমন ভাবে জেল্লা হারায় কেন জানিস ?

কেন ?

বাতাসে যে সালফার গ্যাস রয়েছে তার সঙ্গে রূপোর প্রতিক্রিয়ার জন্য। এখন মজাটা কি জানিস, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কিন্তু মানুষকে রূপোর জিনিসপত্র পরিষ্কার করতে হত না। এমনিতেই সেগুলো চকচক করত।

তাই নাকি ?

হ্যাঁরে। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মানুষ বেশ আয়েস করেই রূপোর জিনিস ব্যবহার করতে পারত। কিন্তু তারপর থেকেই রূপোর জিনিসে এই কালো দাগ পড়তে থাকে।

বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ তাহলে ষোড়শ শতকের পর থেকে বাড়ছে।

হ্যাঁরে বুবুল। ওই সময় থেকেই কয়লা এবং জ্বালানি তেলের ব্যবহারটা বেড়ে যায় আর বাতাসেও দূষিত পদার্থ বাড়াটা শুরু হয় ওই সময় থেকেই। ওই সময় থেকেই এই বায়ুদূষণ নিয়ে মানুষের ভাবনা-চিন্তাও শুরু হয়।

কি রকম ?

বায়ুদূষণ নিয়ে প্রথম বইটি বেরিয়েছিল ১৬৬১ সালে। ব্রিটিশ সাংবাদিক জন এভলিন ওই বইটিতে বায়ুদূষণ বন্ধের জন্য কি কি করা দরকার তার একটা তালিকাও দিয়েছিলেন। বইটিতে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেন, আগের আগের যুগে মানুষ কাঠ কিংবা কয়লা জ্বালিয়ে বাতাস দূষিত করলেও তার পরিমাণটা ছিল অনেক কম। ওই সব জ্বালানি থেকে যে ধোঁয়া কিংবা অন্য দূষিত পদার্থ বেরিয়ে বাতাসকে বিষিয়ে দিত তা সহজেই বাতাসে ভেসে চলে যেতে পারত তাই তাতে ক্ষতিটাও হত অনেক কম। কিন্তু নগর এবং শিল্প গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের বিপদ বাড়তে থাকে। কারখানায় কারখানায় যে পরিমাণ কয়লা পোড়ানো হয় তার ধোঁয়াতেই মানুষের ক্ষতি করে সবচেয়ে বেশি। এভলিন তাঁর বইতে বায়ুদূষণ বন্ধের যেসব রাস্তা দেখান তার জন্য তাঁকেই বলা হয়ে থাকে প্রথম বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিশেষজ্ঞ।

আচ্ছা ছোটকা, এই বায়ুদূষণটা কি শীতের দেশেই বেশি হয় ?

একটু যে বেশি হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন

আর কোন একটা বিশেষ দেশ বা অঞ্চলের সমস্যা এটা নয়, সারা পৃথিবীর সমস্যা এটা।

বুড়ি এতক্ষণে মুখ খোলে। সে বলে, আচ্ছা ছোটকা, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখতাম কয়েকটি ছেলে মেয়ে অক্সিজেন মুখোশ এঁটে স্কুলে যাচ্ছে—এটা কি সত্যি ?

পুরোপুরি সত্যি।

কোথায় এমন হয়েছে ছোটকা ?

জাপানে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ জাপানের পুরনো নাম নিপ্পন বা সূর্যোদয়ের দেশ। কিন্তু সেই সূর্যোদয়ের দেশেই বাতাস এত বেশি বিষাক্ত গ্যাসে ভরে গেছে যে সত্যিই বাচচাদের গ্যাসমুখোশ পরতে হচ্ছে।

গোটা জাপানেই এমন অবস্থা ?

না, ওদের ভাগ্য ভাল, এখনও গোটা জাপানে অবস্থাটা তেমন হয়নি। তবে ইয়োকাইচি শহরে স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন খেলাধুলা করে তখন প্রায়ই তাদের অমন অক্সিজেন মুখোশ পরতে হয়। আবার টোকিওতেও দেখেছি আর এক মজার ব্যাপার।

কি রকম ?

সেখানে ট্রাফিক পুলিশ সবচেয়ে ভিড়ের সময়ও রাস্তায় গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করাটা বন্ধ রেখে সরে পড়ে। সেখানে মোটর গাড়ির ধোঁয়া আর নানা বিষাক্ত গ্যাসে বাতাস এত ভারি যে কোন ট্রাফিক পুলিশের পক্ষেই আধঘণ্টার বেশি একনাগাড়ে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তারা আধঘণ্টা পরে পরেই রাস্তার মোড়ে বসানো অক্সিজেনের চৌবাচচা থেকে একবার পরিশুদ্ধ বাতাস নিশ্বাসে নিয়ে আবার কাজ করে।

জাপানের অবস্থাতো শুনলি, জার্মান, গ্রিস ইত্যাদি দেশের সমস্যা আবার আরেক রকম। ওইসব দেশে অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মত আরেক সমস্যা হ'য়েছে প্রাচীন স্থাপত্যকে রক্ষা করা।

কিরকম ?

ওখানে নোংরা বাতাসে সুন্দর সাদা পাথরের নানা শিল্প সম্পদ, স্থাপত্য কালো হয়ে যাচ্ছে—অনেকগুলি বিষাক্ত গ্যাসের ধোঁয়ায় ক্ষয়ে নষ্টও হয়ে যাচ্ছে।

বুবুল বলে, ছোটকা, আমাদের দেশে তাজমহল নিয়েও তো একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে না ?

হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। তাজমহলকে বাঁচাবার জন্য এখন নানাদিক থেকে আওয়াজ উঠছে।

তাজমহল কি করে বিপন্ন হল ছোটকা ?

আগ্রা থেকে বেশ কিছু দূরে মথুরায় বসেছে এক তৈল শোধনাগার। সেই শোধনাগারের ধোঁয়ায় তাজমহলের সাদাপাথর ময়লা হয়ে যাচ্ছে দেখে এখন সবাই ভাবতে বসেছে কেমন করে একে রক্ষা করা যায়।

আমাদের কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কিন্তু ঠিকই আছে, না ছোটকা ?

মুন্নির কথার জবাবে ছোটকা বলে, হ্যাঁ, তা বলতে পারিস, কলকাতার বাতাস নানা ভাবে বিষিয়ে উঠলেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের এখনও তেমন ক্ষতি করতে পারেনি। তবে তার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকলে চলবে না। কেননা, যেখানে চারিদিক থেকে কলকারখানা কালো ধোঁয়া ছাড়ছে তাতে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা না নিলে খুব শিগগির কলকাতার অবস্থাও হবে জাপান কিংবা জার্মানির মতই।

ছোটকার একথায় সবাই কেমন যেন চুপ করে যায়। ভবিষ্যতের ভয়ে সবারই কেমন যেন একটু ভীতু ভীতু ভাব। ছোটকা চুপ করে আছেন। ওরাও তাই।

সেই ভারি আবহাওয়ার মধ্যেই ভেসে আসে মুন্নির প্রশ্ন, ছোটকা, ঠিক কি ভাবে আমাদের চারদিকের আবহাওয়া বিষিয়ে উঠছে কিংবা কিভাবে তার থেকে রেহাই পাওয়া যায় সেই কথাটা একটু বুঝিয়ে বলবে !

কেন বলব না ? এটা তো তোদেরই ভাল করে জেনে রাখা দরকার। শোন, আমাদের আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে নানাভাবে। বিষিয়ে ওঠার সেইসব ভয়ঙ্কর কারণগুলোকে মোটামুটি সাতটা ভাগে ভাগ করা যায়। এই সাতটা কারণ হল—বাতাসে ভেসে থাকা নানা সূক্ষ্ম কঠিন কণা, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ধোঁয়াশা, মোট জারক, তেজস্ক্রিয় দূষণ এবং অন্যান্য নানা ভাবে দূষণ।

এর মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আমাদের আবহাওয়াকে বিষিয়ে তুলেছে ?

তোর একথার উত্তরে বলতে হয়—ধোঁয়া। প্রতিদিন সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি চিমনি বা উনুন থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তাতে ভরা থাকে

২

নানা সূক্ষ্ম কঠিন কণা আর সেইসব কণা বাতাসে ভাসতে ভাসতে টাটকা শুদ্ধ হাওয়াকে করে তোলে রীতিমত বিষাক্ত।

তোমার কথা কিন্তু ভালভাবে বুঝতে পারলাম না ছোটকা। ধোঁয়া তো হাওয়ায় ভেসে আকাশে মিশে যায়—সেটা আবার আমাদের ক্ষতি করবে কি করে ?

মুন্নি, ধোঁয়াকে তোর ওইরকম নির্দোষ মনে হতে পারে। কিন্তু ওটা মোটেই নির্দোষ নয়। ধোঁয়ার মধ্যে মিশে থাকে কার্বন এবং ঝুল-কালি, হাল্কা ছাই, তেল, গ্রিজ এমনকি বিভিন্ন ধরনের ধাতুর কণাও।

কিন্তু ছোটকা, তার জন্য আমাদের ক্ষতিটা হবে কি ভাবে ?

দেখ, ধোঁয়ার সঙ্গে বাতাসে এই সব সূক্ষ্ম কণাও ভাসতে থাকে। এখন এগুলো যদি বাতাসের চেয়ে ভারি হয়ে ওঠে তাহলে এগুলো পৃথিবীর বুকে নেমে আসে এবং পৃথিবীতে নেমেই নানা আসবাব, জামাকাপড় এবং অন্যান্য সব কিছুর বাইরের দিকে নোংরার স্তর হয়ে জমতে থাকে। আর যদি এগুলো পৃথিবীতে নেমে আসার মত ভারি না হয় তাহলে ওগুলো হাওয়াতেই ভাসতে থাকে এবং আমরা সেই হাওয়া নিশ্বাস নেওয়ার সময় ওইসব দূষিত পদার্থগুলোকেও শরীরের ভেতর টেনে নিই। ফুসফুসের মধ্যে তখন তা স্তরের পর স্তর হয়ে জমতে থাকে।

তাহলে ছোটকা, এই ধোঁয়াই বাতাসে সবরকম সূক্ষ্ম কঠিন কণাকে নিয়ে আসে, তাই না !

না, শুধু ধোঁয়াই এইসব সূক্ষ্মকণাকে বাতাসে নিয়ে আসে না, আরও নানা ভাবে এই সব সূক্ষ্ম কণা বাতাসে এসে মেশে।

সেটা কিরকম ?

যেমন ধর, যে সব কারখানায় ঘষা মাজা করার কাজ হয় কিংবা রং করা হয় সেখান থেকেও নানা সূক্ষ্মকণা বাতাসে এসে মেশে। এমন কি আমরা নিজেরাও নানাভাবে বাতাসে এগুলোকে মিশিয়ে দিচ্ছি।

আমরা মিশিয়ে দিচ্ছি কিভাবে ?

এই যে গামছাটাকে ঝেড়ে নি, কিংবা তোর মা যখন বিছানার চাদরকে পাতবার আগে বাতাসে ক'বার ঝেড়ে নেয় তাতেও অসংখ্য ধুলো বালি অথবা সূক্ষ্মকণা গামছা বা চাদর থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। আবার শুধু একবার যদি আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে এক ঝলক আগুন

বেরিয়ে আসে তবে তাতে বাতাসে কত ময়লা বা সূক্ষ্মকণা ভাসতে পারে জানিস ?

কত ?

পরিমাণটা তোদের মাথা গুলিয়ে দেবার মত। তোরাতো জানিস দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = ঘন। এখন ৯০ সেণ্টিমিটার বা ·৯ মিটার লম্বা, চওড়া এবং উঁচু জায়গার ঘন ·৭৩ মিটার। এইরকম ৭৩ হাজার কোটি ঘন মিটার সূক্ষ্ম কণা পদার্থ ছড়িয়ে পড়ে এক ঝলক অগ্ন্যুৎপাতে।

এত !

হ্যাঁ। অগ্ন্যুৎপাতের কথা ছেড়ে দে। সমুদ্রের ঢেউ থেকে ওপরের দিকে ছিটকে যাওয়া এক ফোঁটা জল বাতাসে শুকিয়ে গিয়ে, অণুবীক্ষণে দেখা যায়, এমন অসংখ্য লবণের কণা বাতাসে ছড়িয়ে দেয়।

তাহলে তো দেখছি, এই পৃথিবীর সব কিছুই নানারকম সূক্ষ্ম কণা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আমাদের বাতাসকে দূষিত করে তুলছে।

না মুন্নি, শুধু আমাদের ওই পৃথিবী নয়, মহাকাশ থেকেও নানা পদার্থ এসে মিশছে বাতাসে। তোরা তো আকাশ থেকে উল্কা পড়তে দেখেছিস ?

হ্যাঁ। কিন্তু ঠাকমা বলে, উল্কা পড়া নাকি দেখতে নেই। আর দেখলেও সাতবার নাকি মহাভারত মহাভারত করতে হয়।

না বুড়ি, উল্কা পড়া দেখলে কিছুই হয় না। আগের লোকের অবশ্য ধারণা ছিল উল্কা পড়া দেখলে ক্ষতি হয়, তাই তাঁরা মহাভারতের মত পবিত্র বইয়ের নাম স্মরণ করতেন। কিন্তু জানিস তো মহাকাশে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানো বস্তুপিণ্ডগুলো পৃথিবীর আকর্ষণে যদি বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাহলে বায়ুর সঙ্গে সংঘর্ষে তা জ্বলতে জ্বলতে ক্ষয় পেতে থাকে। এগুলোকেই বলে উল্কাপাত। তা মহাজাগতিক ওইসব বস্তু বায়ুমণ্ডলে জ্বলে পুড়ে যাবার সময় নানা সূক্ষ্মকণা ছড়িয়ে দেয় বাতাসে। প্রতিবছর এরকম একহাজার টন বা দশ হাজার কুইণ্টাল অতিসূক্ষ্ম উল্কা এই পৃথিবীতে এসে পড়ে।

মহাকাশের উল্কা যেমন বাতাসকে দূষিত করছে তেমন গাছপালা থেকেও যেসব গ্যাস প্রতিদিন বেরুচ্ছে তাও ঘন হয়ে বাতাসের বুকে একটা পাতলা আস্তরণ তৈরি করতে পারে। ঘন জঙ্গলের ওপর অনেক সময় দেখবি যেন কুয়াশা জমে রয়েছে—তা আসলে কিন্তু গাছের ছেড়ে দেওয়া গ্যাস দিয়ে তৈরি ওই পাতলা আস্তরণ।

তোরা হয়তো জিজ্ঞেস করবি, ছোটকা, তুমি যে বলছ বাতাসে এতসব সূক্ষ্ম কণা ঘুরে বেড়ায় তাতে আমাদের ক্ষতিটা কি হচ্ছে? দেখ, সরাসরি যে ক্ষতিটা আমরা দেখতে পাই, বুঝতে পারি, তাহল, বাতাসের এইসব ধুলোবালি এবং সূক্ষ্মকণা সমস্ত জিনিসপত্রকে নোংরা করে দেয়। বাড়ি-ঘর, জামা-কাপড়, মোটরগাড়িই বল, আর মানুষই বল, সব কিছুকে নোংরা কুৎসিত করে দেয় বাতাসের ওইসব আবর্জনা।

বাতাসের ময়লা যদি আমাদের শুধু ওইটুকু ক্ষতি করত তাহলে হয়তো বলার কিছু ছিল না। কিন্তু এরা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের প্রাণশক্তিকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। শুধু যে আমাদের আয়ু কমে যাচ্ছে তা নয়, আমাদের কাজ করার ক্ষমতাকেও কমিয়ে দিচ্ছে বাতাসের ওইসব সূক্ষ্মকণার অনেকগুলি। তাই আজ সবাই চিন্তিত।

ছোটকা, তুমি বললে, বাতাসের কিছু কিছু সূক্ষ্ম কণা আমাদের বেশি ক্ষতি করে। সে সব ক্ষতিকর কণা-কে কি আলাদা ভাবে চেনা গেছে।

কেন যাবে না। যেমন ধর অঙ্গারক বা কার্বন। এটি একটি বিচিত্র চরিত্রের পদার্থ। কার্বন প্রায় সব গ্যাসকেই শুষে নিতে পারে। বেশির ভাগ সাধারণ বিষাক্ত গ্যাস শুষে নিতে পারে বলেই গ্যাসমুখোশ তৈরির সময় কার্বনের ব্যবহার করা হয়। এই কার্বন গ্যাস মুখোশের মধ্য দিয়ে যখন বাতাস যায় তখন বিষাক্ত এবং ক্ষতিকারক গ্যাসগুলিকে কার্বন টেনে নেয় আর মুখোশধারী পায় বিশুদ্ধ বাতাস। এখন আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে যখন বাতাসের এই কার্বনকেও টেনে নিচ্ছি তখন আমরা যে শুধু কার্বনকে গ্রহণ করছি তা নয়, ওই কার্বন যেসব বিষাক্ত গ্যাসকে শুষে নিয়েছে সেগুলিকেও নিই। কার্বনের সঙ্গে এই গ্যাস সরাসরি আমাদের মধ্যে চলে গিয়ে চরম ক্ষতি করে। অথচ বাতাসে যদি কার্বনের ভাগ বেশি না থাকে তাহলে ওইসব বিষাক্ত গ্যাসের অনেকগুলিই আদপে আমাদের শরীরে ঢুকতে পারে না।

বুবুল ফুট কেটে বলে কার্বনকে তো তাহলে ট্রয়ের ঘোড়া বলা যায়। ট্রয়ের ঘোড়ার পেটে যেমন ছিল সেনাদল তেমনি কার্বনও একা আমাদের শরীরে না ঢুকে সঙ্গে আবার বেশ কিছু অস্ত্রধারী সেনাকেও নিয়ে যাচ্ছে।

উদাহরণটা তোমার চমৎকার হয়েছে বুবুলবাবু। এর জন্য তোমার একটা চকলেট পাওনা রইল।

ছোটকার প্রশংসায় বুবুলের যে আনন্দ হয়েছে সেটা ঢাকতেই সে হঠাৎ যেন বড় গম্ভীর হয়ে যায়। আর গম্ভীরভাবেই বলে, ছোটকা, বাতাসে আর কি কি সূক্ষ্ম পদার্থ ঘুরে বেড়ায় ?

কার্বনের মতই আর একটি সূক্ষ্ম কঠিন কণা বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার নাম ক্যাডমিয়াম। ছোটকা বলে ক্যাডমিয়াম হল টিনের মতই একরকম ধাতু। এখন অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে হৃদরোগের একটা সম্পর্ক রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য-বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ রবার্ট ই ক্যারল গবেষণা করে দেখেছেন, যেসব শহরের বাতাসে ক্যাডমিয়ামের ভাগ বেশি সেসব শহরে হৃদরোগে মৃত্যুর হার সাধারণমৃত্যু হারের চেয়ে অনেক বেশি। বাতাসে এই ক্যাডমিয়াম আকরিক-গলন কেন্দ্র থেকে আসে বলে।

কার্বন, ক্যাডমিয়ামের মত আরেকটি ঝামেলার জিনিস হচ্ছে ঝুল এবং কালি। এতে যে শুধু শরীরের ক্ষতি হয় তা নয়, এটা একধরনের আর্থিক ক্ষতিরও কারণও হয়ে দাঁড়ায়।

ঝুল কি করে টাকা নষ্টের কারণ হবে ছোটকা ?

কেন নয় বল ? তোরা তো দেখিস বাড়িতে যে ঝুল পড়ে তা পরিষ্কার করার জন্য আলাদা ঝাড়ুনি কিনতে হয়। এতে খরচটা অবশ্য তেমন হয় না। কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে ঝুল সমস্ত বাড়িটার সৌন্দর্য একবারে নষ্ট করে দেয়। সেখানে ঝুল পরিষ্কারের জন্য হয়ত ঘন ঘন বাড়ি ঘর দোর রঙই করতে হয়। এতে ঝামেলা যেমন আছে, তেমনি আছে টাকা খরচের ব্যাপার। নিউইয়র্ক হিলটন হোটেল একটা নামকরা হোটেল। কিন্তু ঝুল আর ছাইয়ে হোটেলের সামনের অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে তা পরিষ্কার করতে ৫০ হাজার ডলার খরচ করতে হয়। বছর দেড়েক বাদেই কিন্তু ঝুল কালি ছাইয়ে অবস্থা যে কে সেই। এখন তুই-ই বল, বছর দেড়েক অন্তর অন্তর অত টাকা খরচ করতে হলে লোকসান বাড়ে কিনা ?

এতক্ষণ তোদের যে কটা জিনিসের কথা বললাম, তা ছাড়াও বাতাসে এমন কিছু সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থ আছে যাদের বাতাসকে বিষিয়ে দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে। তবে সেগুলো সচরাচর সব জায়গার বাতাসে থাকে না, এটাই যা রক্ষে।



চিমনির ধোঁয়া

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসে যেমন ক্ষতিকারক কঠিন পদার্থ থাকে তেমন বিষাক্ত অনেক গ্যাসও তো আছে!

নিশ্চয়ই আছে বুবুলবাবু।

বাতাসের মধ্যে যেসব বিষাক্ত গ্যাস মিশে আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড। সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস সাধারণত মানুষের ফুসফুস এবং শ্বসনযন্ত্রের অন্যান্য অংশকে আক্রমণ করে। শ্বসনযন্ত্রে চুলের মত যে ময়লা প্রতিরোধক বা সিলিয়া রয়েছে তার পরিষ্কার করার ক্ষমতাটা কমিয়ে দেয়। এই গ্যাসে চোখ বা চামড়া বেশ জ্বালা জ্বালা করে। শুধু তাই নয়, দাঁতের এনামেলও নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধু এই সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসে। সবচেয়ে ভয়ের কথা, এই গ্যাসে মানুষের ক্ষতিটা হয় বেশ পাকাপাকি ধরনের এবং হাজার চিকিৎসাতেও সে ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

কিন্তু ছোটকা, বাতাসে এই গ্যাস আসে কোথা থেকে?

মুন্নি, বাতাসে এই গ্যাস আসে নানাভাবে, তবে সবচেয়ে বেশি আসে তেল আর কয়লা পোড়ানো থেকে। সব ধরনের তেল বা কয়লায় কিন্তু একই পরিমাণ গন্ধক বা সালফার থাকে না। যাতে সালফারের পরিমাণ যত বেশি থাকবে তা পোড়ালে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসও তত বেশি পরিমাণ হবে। যেমন বেশি গন্ধকযুক্ত কয়লা যদি পোড়ানো হয় তবে সে কয়লার মোট ওজনের ১০ শতাংশ পর্যন্ত সালফার ডাইঅক্সাইড হয়ে বাতাসে মিশতে পারে। এই ধরনের গ্যাসই লণ্ডনের সেই মারাত্মক ধরনের ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতে পারে। এই গ্যাসে শুধু যে মৃত্যু হয় তাই নয়, শ্বাসজনিত অন্যান্য নানা ধরনের অসুখ-

বিসুখও হতে পারে। হৃদরোগের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা তো অনেক বিশেষজ্ঞই বলেন।

জেনে রাখ, এক টন সাধারণ কয়লা পোড়ালে বাতাসে মেশে ৩৭ কেজির মত সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস। মোটর গাড়িতে প্রতি হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন পুড়লে বাতাসে মেশে ১৮ কেজির মত সালফার ডাইঅক্সাইড।

সালফার ডাইঅক্সাইড মানুষের শরীরে যখন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তখন পশুপাখিরও যে এটা ক্ষতি করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই গ্যাসের প্রকোপে গবাদি পশুর মৃত্যু কৃষকের এক মস্ত ক্ষতি। কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থারও হেরফের হয়ে যেতে পারে এর জন্য।

শুধু মানুষ বা পশুপাখির কথাই বা বলি কেন, এই গ্যাসে ক্ষতি হয় গাছপালারও। সালফার ডাইঅক্সাইড মাটিকে বেশি দূষিত করলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখানে ফসল নাও হতে পারে।

এই সঙ্গে আরো জেনে রাখ, এই গ্যাসে ক্ষতি হয় সবরকম জড় পদার্থেরও। পৃথিবীর বহু জায়গায় বহু পুরাকীর্তি নষ্ট হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে এই গ্যাসের প্রকোপে।

আচ্ছা ছোটকা, তুমি বললে, বাতাসের মধ্যে মিশে থাকা সবচেয়ে ক্ষতিকর গ্যাস হল সালফার ডাই-অক্সাইড। তাহলে নিশ্চয়ই আরো কিছু কিছু ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে মেশে।

তাতো মেশেই বুড়ি।

সেগুলো কি গ্যাস ছোটকা ?

এক এক করে বলছি শোন। সালফার ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর যেসব ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে মেশে তার একটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড। বাতাসে ১০ হাজার ভাগের মধ্যে এক ভাগ যদি এই গ্যাস থাকে তাহলেই মানুষ বা অন্য জীবজন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ে আর সাড়ে সাতশ ভাগের মধ্যে যদি এক ভাগ থাকে তাহলে ৩০ মিনিটের মধ্যেই মানুষ মারা যাবে। কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসটা হচ্ছে কার্বন আর অক্সিজেনের মিশ্রণ। মোটরগাড়ি ইত্যাদি থেকে যে পোড়া ধোঁয়া বেরিয়ে আসে তার মধ্যেও থাকে এই গ্যাস। মোটর ইঞ্জিনে প্রতি হাজার গ্যালন গ্যাসোলিন পুড়লে বাতাসে এসে মেশে প্রায় চারশ কেজি কার্বন মনোক্সাইড। এত কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে মেশা সত্ত্বেও বহুদিন ধরেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলতেন, মুক্ত বাতাসে এই গ্যাস তত ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু ইদানীং যেসব তথ্য পাওয়া গেছে

তাতে মুক্ত বাতাসেও কার্বন মনোক্সাইডের অস্তিত্ব চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে।

কেন ছোটকা, এটা নিয়ে চিন্তার কি আছে ?

চিন্তার কারণটি কি জানিস বিল্টু, কার্বন মনোক্সাইড রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়।

রক্ত যদি কম অক্সিজেন বহন করে তাহলে ক্ষতিটা কি ?

ক্ষতিটা ? মুন্নি, এই যে পাম্প দিয়ে তোদের বাড়িতে জল ওঠে, কত মিনিটে তোদের ট্যাঙ্কটা ভরে যায় ?

২০ মিনিটে।

কিন্তু গরম কালে যখন জলের স্তর নেমে যায় তখন ট্যাঙ্কটা ভরতে কতক্ষণ সময় লাগে ?

৪০।৪৫ মিনিট।

এই বাড়তি সময় পাম্পটা চলার জন্য পাম্পটার বেশি ক্ষতি হচ্ছে তো ?

হচ্ছেই তো। সেই জন্যই তো বাবা গরমকালে সবাইকে বকাবকি করে, বলে একদম জল নষ্ট করবে না—অতক্ষণ ধরে পাম্প চালালে ইলেকট্রিক বিল তো বাড়বেই, তারপর পাম্পটা না বিগড়ে যায়।

তা এই পাম্পের মতই আমাদের হার্ট দিনরাত্তির অক্সিজেন যুক্ত রক্ত পাম্প করে শরীরের নানা জায়গায় পাঠাচ্ছে। এখন কম অক্সিজেনযুক্ত রক্ত হার্টে এলে হার্টকে অনেক বেশিবার পাম্প করতে হয় প্রয়োজনীয় অক্সিজেনযুক্ত রক্তের জন্য। আর বেশি পাম্প করার জন্য হার্টের কর্ম-ক্ষমতাও কমে আসে। ফলে একদিন দেখা দেয় হৃদরোগ যাকে তোরা বলিস হার্টঅ্যাটাক। শুধু যে এর জন্য হার্টের ক্ষতি হচ্ছে তা নয়, রক্ত কম অক্সিজেন নিতে পারায় শরীরের মধ্যে আরো বেশি অক্সিজেনের দরকার হয়—ফলে আমাদের যে শ্বসন যন্ত্র তার ওপর পড়ে বাড়তি চাপ। তাই ক্ষতি হয় তারও।

তাহলে তো ছোটকা, কার্বন মনোক্সাইড একদিকে সালফার ডাই-অক্সাইডের চেয়েও মারাত্মক।

হ্যাঁ, সালফার ডাইঅক্সাইডের চেয়ে মারাত্মক না হলেও কার্বন মনোক্সাইড খুব কম মারাত্মক নয়।

বাতাসের সঙ্গে মিশে আমাদের ক্ষতি করে আর কি কি গ্যাস ছোটকা ?

বুড়ির কথায় ছোটকা বলে, আমাদের আবহাওয়াকে আর যারা বিষিয়ে তোলে তাদের বলা হয় ধোঁয়াশা বিক্রিয়ক বা স্মগ রিঅ্যাক্ট্যান্ট। সাধারণত এগুলি হাইড্রোকার্বন বা হাইড্রোজেন এবং কার্বনের মিশ্রণে তৈরি গ্যাস এবং নাইট্রোজেনের সঙ্গে যুক্ত অক্সিজেন বা নাইট্রোজেনের অক্সাইড হিসেবে ক্রিয়া করে। ঐ সবেরই সৃষ্টি স্টোভ, চুল্লি অথবা ওই জাতীয় জিনিসের আধপোড়া তেল থেকে। তবে আবহাওয়াকে এই বিষ গ্যাস সবচেয়ে বেশি দেয় মোটর ইঞ্জিনের আধপোড়া তেল।

ছোটকা মোটর ইঞ্জিনের আধপোড়া তেল কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না? মোটরের তেল আবার আধপোড়া হয় কি করে?

কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস মুন্নি। ব্যাপারটা কি জানিস, মোটরের মধ্যে তেলের যে দহনক্রিয়া হয় তা সম্পূর্ণ হলেই তা রূপান্তরিত হয় গতিশক্তিতে। যখন, মোটরগাড়ির গতি কমানো কিংবা বাড়ানো হয় তখনই মোটর ইঞ্জিনের ক্ষমতা অনেক কমে যায়, ফলে দহনক্রিয়াও সম্পূর্ণ হয় না। আর তারই ফলে মোটরগাড়ির এক্সজস্ট পাইপ দিয়ে হাইড্রো-কার্বন বেরিয়ে এসে বাতাসের সঙ্গে মেশে। এছাড়া ইঞ্জিনের মধ্যে এমন কিছু ক্রিয়া চলে যাতে যার থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড বেরিয়ে এসে হাওয়ার সঙ্গে মেশে। এর পরই শুরু হয় এক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া। সূর্যকিরণের মধ্যে হাইড্রোকার্বন নাইট্রোজেনের অক্সাইড এবং মুক্ত অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা অদ্ভুত ধরনের ধোঁয়াশা তৈরি করে। সূর্যের আলো না থাকলে এ ধরনের বিক্রিয়া হয় না বলে এটাকে ফটোকেমিকেল স্মগও বলা হয়।

কিন্তু এগুলো আমাদের ক্ষতি করে কি করে ছোটকা?

দেখ বুবুল, নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইডের একটি হল নাইট্রিক অক্সাইড। এটি রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। ফলে কার্বন মনোক্সাইড যেভাবে ক্ষতি করে এটিও ঠিক সেই ভাবেই আমাদের ক্ষতি করে। শুধু তাই নয়, এটা যদি খুব গাঢ় হয়ে ওঠে তাহলে সৃষ্টি হয় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের এবং সেটা আমাদের ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। স্বাভাবিকের চেয়ে বায়ুদূষণ বেড়ে গেলে আমাদের চোখ যে জ্বালা করে তার মূলে রয়েছে এই নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড।

অন্যতম ধোঁয়াশা বিক্রিয়ক হাইড্রোকার্বন বিভিন্ন আকার ও পরিমাণে বাতাসে মেশে। বলা হয়, মোটর ইঞ্জিনের ধোঁয়ার সঙ্গে প্রায় দুশ ধরনের

হাইড্রোকার্বন বেরিয়ে আসে। একটন কয়লা পুড়লে প্রায় ৮ কেজি হাইড্রোকার্বন যৌগ বেরিয়ে আসে এবং তার কয়েকটি যৌগ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।

ও ছোটকা, তুমি যত সাধারণ বলে পরে পরে বলছ, সেগুলো যে দেখছি আগের গুলোর চেয়ে আরো মারাত্মক। আগে বললে হার্ট-অ্যাটাকের কথা এখন বলছ ক্যান্সার। এরপর আমরা বাঁচব কি করে?

কথাগুলো বলতে বলতে মুন্নি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।

মুন্নির অবস্থা দেখে বুবুল, বুড়ি, বিল্টু ফিকফিক করে হাসতে থাকে। ছোটকা কিন্তু তাদের প্রায় ধমকে বলেন, এতে হাসবার কি আছে? ও তো প্রায় ঠিক কথাই বলেছে। এর পরই মুন্নিকে তিনি বলেন, তোর ভয়টা স্বাভাবিক। কিন্তু পড়িসনি সত্যেন দত্তর সেই কবিতাটি—

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বিধির কৃপায় বেঁচে গেছি মোরা অমৃতের টীকা পরি।

আসলে কি জানিস, বাতাসে এইসব দূষিত পদার্থ মিশে গিয়ে যেমন আমাদের ক্ষতি করে, তেমন তা রোধ করার কয়েকটি ব্যবস্থাও প্রকৃতি করে রেখেছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, সেসব ব্যবস্থাকেও বুঝে এবং না বুঝে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি বলেই বিপদটা এত বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। ও ব্যাপারটা নিয়ে আমি পরে তোদের সঙ্গে কথা বলব। এখন বরং বাতাসের এইসব দূষিত গ্যাস কিভাবে আসে অথবা কি ধরনের ক্ষতি করে সেটা জেনে নে।

হ্যাঁ ছোটকা, তুমি সেগুলোই আমাদের বল।

বুবুলের মুখের ভাবখানা দেখে ছোটকা হেসে ফেলে বলেন, বুবুল, তোমাকে অমন পণ্ডিতমশাইয়ের মত মুখ করতে হবে না। মুখটা স্বাভাবিক করে শুধু শুনে যাও।

আমি আবার পণ্ডিতমশাইয়ের মত মুখ করলাম কোথায়? ঠোঁট উল্টে বলে বুবুল।

তাহলে করনি, আমারই ভুল হয়েছে। যাকগে ওসব কথা। যা বলছিলাম, হাইড্রোকার্বন থেকে যে ক্যান্সার হতে পারে এটা সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরাই বলছেন। এই ধরনের একটি হাইড্রোকার্বন হল বেনজো-পাইরেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে যেসব রাসায়নিক যৌগ বেরিয়ে আসে

এটা তার একটা এবং সিগারেটের ধোঁয়া থেকে ক্যান্সার হয়। তবে এই বেনজোপাইরেন শুধু সিগারেটের ধোঁয়ায় নয়, কয়লার ধোঁয়াতেও আছে। সত্যি কথা বলতে কি, কয়লার ধোঁয়া থেকেই সবচেয়ে বেশি বেনজোপাইরেন বাতাসে মেশে। ১০ শতাংশ বেনজোপাইরেন আসে মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে। এর চেয়েও বেশি আসে রাস্তার পিচ, তেল পোড়ানো এবং কৃত্রিম রবার থেকে। এমনকি দূষিত জল থেকে ধরা শুক্তি বা ঝিনুকের মধ্যেও এটি থাকে এবং যারা এগুলি খায় তারা না জেনেই এর সঙ্গে বেশ কিছুটা বেনজোপাইরিনও খেয়ে ফেলে। তোরা মাঝে মাঝে বলিস না, অমুক লোক তো জীবনে সিগারেট খায় না, তাহলে তার ক্যান্সার হল কি করে? উত্তরটা হচ্ছে, সিগারেট না খেয়েও আমাদের মত শহরে যারা বাস করে তারা প্রতিমুহূর্তে সিগারেটের বিষকে খাচ্ছে। কেমন করে জানিস, শহরের যে বাতাস আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে নিই, তাতে সাতটা সিগারেটে যে পরিমাণ বেনজোপাইরিন থাকে ততটা বিষ শরীরে নিয়ে নেওয়া হয়। শুধু আমরা কেন, নবজাতক শিশুটি পর্যন্ত এ শহরে প্রতিদিন নিঃশ্বাসের সঙ্গে গোটা এগারো সিগারেটের বিষ শরীরে নিচ্ছে। এই তো অল্প কয়েকদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা বিশ্বজুড়ে সমীক্ষা চালিয়ে বলেছে, বোম্বাইতে নিশ্বাস নেওয়া মানে দিনে দশটা করে সিগারেট খাওয়া।

জেনে রাখ, এছাড়া বাতাসকে বিষিয়ে দেয় মোট জারক বা টোটাল অক্সিড্যান্ট।

আচ্ছা ছোটকা, মোট জারক বা টোটাল অক্সিড্যান্ট কাকে বলে?

বুবুল, এক কথায় তুই বলতে পারিস, অক্সিজেনের সঙ্গে কোন রাসায়নিক মিলনকে মোট জারক বলে। জারক হচ্ছে জারণক্রিয়ার একটি এজেন্ট—এই পদার্থটি জারণের সময়ে অক্সিজেন যুগিয়ে থাকে। আমাদের বাতাসে ওজোন বলে যে গ্যাসটি আছে তা মোট জারকের একটি সাধারণ উদাহরণ।

আচ্ছা ছোটকা, এই যে ওজোনের কথা বললে, এটা তো আরো বিশুদ্ধ অক্সিজেন, এতে তো আমাদের অনেক বেশি উপকার হয়, তাহলে এটা বাতাসকে বিষিয়ে তুলবে কি করে?

দেখ বুবুল, ওজোন গঠনের দিক থেকে অক্সিজেনের মত হলেও চরিত্রের দিক থেকে কিন্তু একবারে আলাদা। আমাদের এই পৃথিবী

নামক গ্রহে প্রতিটি প্রাণের টিকে থাকার অবশ্য পদার্থটি হল অক্সিজেন গ্যাস। এই অক্সিজেন গ্যাস গঠিত হয় দুটি অক্সিজেন অ্যাটম বা পরমাণুর যোগে। অন্যদিকে ওজোন তৈরি হয় তিনটি অক্সিজেন পরমাণু মিলে। অন্য কথায়, যদি একটা অক্সিজেন অণুকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব, এটা ঠিক একই রকম দেখতে দুটো খুব ছোট পদার্থ দিয়ে গঠিত। এই ছোট পদার্থকেই বলে পরমাণু।

আচ্ছা ছোটকা, অক্সিজেন গ্যাস একটা পরমাণু দিয়ে গঠিত হয় না কেন?

মুন্নি, তুই আবার একটা কথার মত কথা জিজ্ঞেস করেছিস। হ্যাঁ, অক্সিজেন অণু মাত্র একটা পরমাণু দিয়েও গঠিত হতে পারত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অক্সিজেন পরমাণু এত বেশি বিক্রিয়ক যে একা সে কিছুতেই থাকতে পারে না। কাজেই একটা অক্সিজেন পরমাণুর অন্য পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে অসংখ্য অন্যান্য পদার্থ তৈরি করে।

কিন্তু ওজোন তো শুধুই অক্সিজেন দিয়ে তৈরি তাহলে এটার চরিত্র অক্সিজেন গ্যাসের থেকে আলাদা কেন?

বুবুল, তার কারণ, অক্সিজেন গ্যাস যেখানে দু'টি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত, ওজোন সেখানে তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে তৈরি। অক্সিজেনের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হলেই অক্সিজেন ভেঙে একের সঙ্গে মিলে ওজোন তৈরি করে। তাই বজ্রপাতের সময় বাতাসের মধ্য দিয়ে যে বিদ্যুৎ শক্তি প্রবাহিত হয় তখন প্রচুর পরিমাণে ওজোন তৈরি হয়। তবে আবহাওয়ামণ্ডলে যে ওজোন রয়েছে তার বেশির ভাগই তৈরি হয় অনেক উঁচুতে আবহাওয়া মণ্ডলের একদম ওপরের দিকে অক্সিজেনের সঙ্গে সূর্য থেকে আসা আল্ট্রা ভায়োলেট রে বা অতিবেগুনি রশ্মির ক্রিয়ায়।

আমাদের ভাগ্য খুব ভাল, যে ওজোন আবহাওয়া মণ্ডলের ওপরের দিকে থাকে। কেননা, এই ওজোনের স্তরটা অনেকটা ছাঁকনির কাজ করে। সূর্য থেকে যে অতি বেগুনি রশ্মি আসে তার অনেকটাই শুষে নেয় এই ওজোনস্তর। ওজোন অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫৩ কিমি উঁচুতে দেখা দেয় একটি তাপমণ্ডল। তাছাড়া ওজোন যদি সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মিকে শুষে না নিত তাহলে পৃথিবীতে সূর্যের

তাপের পরিমাণ হত দ্বিগুণেরও বেশি। তাতে রোদের জ্বলুনি যেমন বাড়ত তেমন আমাদের জীবনটাও হত আরো অস্বস্তিতে ভরা।

ওজোন ওপরের স্তরে থাকায় আমরা বেঁচে গেছি কেন জানিস, ওজোন একদিক থেকে খুব বিষাক্ত গ্যাস। এটা গাঢ় বা কনসেনট্রেটেড অবস্থায় কি প্রাণী, কি উদ্ভিদ সবাইকেই মেরে ফেলতে পারে।

তাহলে ছোটকা, তুমি বলছ, ওজোন আমাদের নাগালের মধ্যে না থাকাটাই লাভ।

নিশ্চয় বুড়ি। তবে ভাবিস না, আমরা নিশ্বাসের সঙ্গে একবারেই ওজোন নিই না। অনেকসময় বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ওজোন নিচে নেমে আসে। তাছাড়া আবহাওয়ায় ওপরের অংশে যেভাবে ওজোন তৈরি হয়, ঠিক সেইভাবে নিচের অংশেও হতে পারে। আর তোরা জেনে রাখ, মোট জারকগুলির মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে এই ওজোন। কেননা, এটা যদি মেরে ফেলার মত গাঢ় নাও হয়, তবু সামান্য গ্যাসেও আমাদের চোখ জ্বালা, কাশি এবং বুকে ঘা ইত্যাদির মত নানা আধিব্যাধি দেখা দিতে পারে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, নিশ্বাসের সঙ্গে ওজোন গেলে ফুসফুসের কলা বা টিস্যু অদ্ভুত ধরনের শক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু ছোটকা, তুমি যে বললে, ওজোন শুধু প্রাণী নয়, উদ্ভিদের ক্ষতি করে, সেটা কেমন ভাবে ?

বিল্টু, ওজোন উদ্ভিদকে আক্রমণ করে পাতার ওপরের দিকে, ঠিক ছালের নিচে। ফলে নানা ধরনের দাগ দেখা দেয়। আঙুর, আনারস, আলু, গমের মত বেশ কিছু দরকারি ফল এবং শস্যের ওপর ওজোনের হামলটা হয় বেশি। তাই বিশেষ করে কৃষকের কাছে ওজোন রীতিমত অভিশাপ। তাছাড়া ওজোন কাপড় রঙিন করার রঙকেও নষ্ট করে দেয়।

আচ্ছা ছোটকা, বাতাসে ওজোন আছে কিনা কিংবা বেশি আছে কিনা তা কি আলাদা করে বোঝা যায় ?

কেন যাবে না বুবুল। পরীক্ষার রাস্তাটা খুব সোজা। তুই একটুকরো রবারের নলকে নিয়ে টান—দেখ কত তাড়াতাড়ি সেটা ফেটে যাচ্ছে—তাহলেই বুঝতে পারবি বাতাসে ওজোন কেমন বা কতটা আছে। এই কারণে ওজোন থাকলে মোটর গাড়ির টায়ারও সহজে ফেটে যায়।

ছোটকা, তুমি যে একটু আগে তেজস্ক্রিয়তার কথা বললে, সেটা কি সবজায়গায় এবং সবার ক্ষেত্রেই ঘটছে ?

হ্যাঁ মুন্নি। এই পৃথিবীতে যত প্রাণী এবং উদ্ভিদ আছে তারা সবাই প্রতিমুহূর্তে কোন না কোনরকম তেজস্ক্রিয়তার সামনে পড়ছে।

সেটা কেমন করে হবে ছোটকা ? তেজস্ক্রিয়তা তো—

আর বলতে হবে না বুড়ি। বুঝতে পেরেছি তুইকি বলতে চাস। শুধু তোর কেন, সবারই একটি ভুল ধারণা আছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণ শুধু মাত্র পরমাণু বোমা বা ওই জাতীয় অস্ত্র থেকে হয়। কিন্তু ধারণাটি একবারেই ভুল। পরমাণু অস্ত্র থেকে একধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নিশ্চয়ই হয়—এবং সেটি ভয়ঙ্কর ভাবেই হয়। কিন্তু আমাদের শরীরে প্রতিমুহূর্তে তেজস্ক্রিয় বস্তুর প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে কিন্তু ওই পরমাণু অস্ত্র নয়।

তবে ?

প্রতিমুহূর্তে যে মহাজাগতিক রশ্মি এই পৃথিবীতে নেমে আসছে তাতেও থাকে একধরনের তেজস্ক্রিয়তা। তাছাড়া প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ যেখানে বাস করে সেখানেও একধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটছে পৃথিবীর তেজস্ক্রিয় আকরিক থেকে। এই যে আকাশ এবং পৃথিবী থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটছে এটাকে বলা হয় ব্যাকগ্রাউণ্ড র‍্যাডিয়েসন' বা পশ্চাদ্‌ভূমির তেজস্ক্রিয়তা। তাছাড়া সভ্যমানুষ নিজেরাও তেজস্ক্রিয়তার মুখোমুখি হবার মত বেশ কিছু সামগ্রী তৈরি করে নিয়েছে—তা থেকেও তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটে আমাদের শরীরে।

তুমি কি পরমাণু অস্ত্রর কথা বলছ ?

না বুবুল, আমি তো আগেই বলেছি, পরমাণু অস্ত্র নয়। আমাদের প্রয়োজন কিংবা প্রমোদনের জন্য এমন কিছু জিনিস আমরা তৈরি করেছি যার থেকেও কমবেশি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটে। তবে এই বিকিরণের পরিমাণ এত কম যে চট করে তার প্রতিক্রিয়াটা আমরা ধরতে পারিনা।

সেগুলো কি ছোটকা ?

এই ধর এক্সরে। এক্সরে যেমন শরীরের মধ্যের অংশের ছবি তুলছে তেমন একধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ঘটাচ্ছে শরীরে। অবশ্য শুধু এক্সরের কথা বলি কেন, আমার হাতে যে ঘড়িটা দেখছিস—এর ডায়াল

থেকেও একধরনের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হয়। তোরা যে টিভি দেখিস সেই টিভিও তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায়। তাই তো বিজ্ঞানীরা এখন টিভির সামনে যেতে একদম বারণ করেন। কেননা, এসবের প্রতিক্রিয়াটা কম হলেও ক্ষতিটা কিন্তু স্থায়িভাবেই হয়।

তাহলে তো বাপু এগুলো ব্যবহার না করলেই হয় বাপু?

বুড়ি-থুরথুরি—তাতে যে আমাদের সুখসুবিধেটাও অনেকটাই ছাঁটাই হয়ে যাবে। আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যও কমে যাবে অনেকটাই। তাই ওগুলো বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। বাদ অবশ্য একটাকে দেওয়া যায় এবং সেটা বাদ দেওয়া এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। মানুষ সেটি বুঝেওছে—তবুও একধরনের দম্ভ দেখাতে গিয়ে সেটাকে বাদ দিচ্ছে না—এবং না দিয়ে গোটা প্রাণিজগতের সঙ্গে নিজেরও চরম সর্বনাশ ডেকে আনছে।

তুমি কিসের কথা বলছ ছোটকা?

আমি বলছি পরমাণুবিস্ফোরণ পরীক্ষার কথা। তবে মানুষ এব্যাপারেও এখন অনেক সচেতন হয়েছে। তাই মাটির ওপর এখন আর বিস্ফোরণ ঘটানো হয়ই না। তবে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য অংশ নষ্ট করার ব্যাপারেও খুব সতর্কতা নেওয়া দরকার। মাটির ওপরে পরমাণু বিস্ফোরণ যেমন বাতাসকে অতিমাত্রায় বিষিয়ে দিয়ে সবরকম প্রাণী বা উদ্ভিদের মৃত্যু ঘটায় তেমনি তেজস্ক্রিয় আকরিক নিষ্কাশন, শোধন প্রকল্প, পারমাণবিক রিঅ্যাকটর, পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য অংশ গুলিও প্রাণী এবং উদ্ভিদের মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

এইসব বর্জ্য অংশের তেজস্ক্রিয়তার হিসেব দিয়েছেন একজন বিজ্ঞানী। তিনি বলেছেন, ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি মোটামুটি ৬৫ হাজার টন রেডিয়াম থেকে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণ হতে পারে এমন ১৩৫ কোটি লিটার পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থ তৈরি হবে। এই বর্জ্য পদার্থ খুবই মারাত্মক বলে একে পুড়িয়ে ফেলা যাবে না। কোন রাসায়নিক দিয়ে নিঃশেষ করা যাবে না। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এগুলি যাতে কোন কিছুর সংস্পর্শে আসতে না পারে এমন জায়গায় এগুলিকে মজুত করে রাখতে হবে। একসময় এগুলিকে একটা আধারের মধ্যে ঢুকিয়ে চারদিক বন্ধ করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এটাও একটি মারাত্মক ব্যবস্থা। কেননা কোন রকমে যদি ওই আধার ভেঙে বা ক্ষয়ে যায় তাহলে সমুদ্রের জলের সঙ্গে ওই বর্জ্য পদার্থ

মিশে মহা অনর্থ ঘটাবে। তাই এখন মাটির সাতশ থেকে ১ হাজার ফুট নিচে চুণাপাথরের স্তরের মধ্যে এইসব বর্জ্য পদার্থকে সিমেণ্ট এবং অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে তরল করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। চুনাপাথর স্পঞ্জের মত বলে জলীয় অংশটাকে শুষে নেয় এবং বর্জ্য পদার্থও তার মধ্যে শক্ত হয়ে থাকে। যদি ভূমিকম্প বা অন্য কোন কারণে চুনাপাথরের স্তর ফেটে এসব বর্জ্য অন্য জিনিসের সংস্পর্শে আসে তাহলেও কিন্তু ঘটবে একই ধরণের অনর্থ।

তাহলে তো দেখছি তেজস্ক্রিয়তায় বিষের ভয়টাই সবচেয়ে মারাত্মক।

হ্যাঁ তা বলতে পারিস বুবুল। তবে একটা কথা কি জানিস, এই পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে মানুষ এখন অনেকটা সচেতন এবং এটা নিয়ন্ত্রণ করাটা এখনও তার হাতে এবং ইচ্ছার মধ্যে আছে—তাই এটা মারাত্মক হলেও এক্ষুণি তেমন ভয় পাবার কিছু নেই।

তার মানে তুমি বলতে চাইছ, এটা ছাড়া আরো কিছু আছে এবং তা নিয়েই আমাদের ভাবনা চিন্তা করা দরকার—তাই তো ?

ঠিক ধরেছিস।

তা সে জিনিসটা কি ?

কি কি ভাবে আমাদের চারপাশের বাতাস বিষিয়ে যায় এতক্ষণ আমি তোদের তাই বললাম। কিন্তু ওগুলো ছাড়াও আরও কয়েকটা জিনিস আছে যা আমাদের বাতাসকে সহজেই বিষিয়ে তোলে। এর মধ্যে দুটো জিনিসের কথা আলাদা করে বলতে হয়। এর একটা কার্বন ডাই-অক্সাইড। কার্বন ডাইঅক্সাইড এমন একটি পদার্থ—যা প্রায় প্রতিটি সজীব পদার্থই বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছে। যেমন আমরা অর্থাৎ মানুষ—প্রশ্বাসের সঙ্গে দেহ থেকে বের করে দিচ্ছি কার্বন ডাইঅক্সাইড। উদ্ভিদও তাদের শ্বসন প্রক্রিয়ার সময় কিছুটা কার্বন ডাইঅক্সাইড বাতাসে ছাড়ে তবে তাদের খাবার অর্থাৎ সাধারণ শর্করা তৈরির সময় সালোক সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডকেই কাঁচা মাল হিসেবে কাজে লাগায়।

যাই হোক, এই বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই কিন্তু আমাদের বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়েই চলেছে।

কেন ছোটকা ?

এই সময় থেকেই কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন ইত্যাদি 'জীবাশ্ম জ্বালানি' ব্যবহারের পরিমাণ বেড়েছে বলে। তবে কি জানিস, কার্বন ডাই-

অক্সাইড গ্যাসটা খুবই ক্ষতিকারক হলেও এখুনি আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই। তার কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড খুব সহজেই জলের মধ্যে মিশে যায় এবং সবুজ গাছপালাও তাদের খাবার তৈরির জন্য এই গ্যাসটাকেই বেছে নেয়। কিন্তু ভয়টা অন্য জায়গায়।

এই তো বেশ আশার কথা শোনাচ্ছিলে ছোটকা। এর মধ্যে আবার ভয়টা টানছ কেন?

টানছি কি আর সাধে মুন্নি, টানছি দায়ে পড়ে। যেভাবে শহর, রাস্তা ইত্যাদি তৈরি করতে গিয়ে বনের পর বন, সবুজ গাছপালা সবকিছু সাফ ফরে ফেলা হচ্ছে ভয়টা দেখা দিচ্ছে সেখানেই। গাছপালা কমলে তারা যে অক্সিজেনটা ছেড়ে দেয় তার পরিমাণ কমবে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়বে। একসঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণটা হবে আরো বেশি। আর জানিস তো, কার্বন ডাইঅক্সাইড তাপ শোষক এবং বর্ণহীন তাই সূর্য-রশ্মিকেও অবাধে এই পৃথিবীতে আসতে দেবে। তাই আবহাওয়ায় যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়তে থাকে তাহলে আবহাওয়া-মণ্ডলের তাপ-মাত্রাও বাড়তে থাকবে।

একটু আগে তুমি যে সবুজ বাড়ির গল্প বললে সেটা তো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড নিয়েই।

হ্যাঁ বুবুল, তুই ঠিকই ধরেছিস। যদি বছরের পর বছর ধরে আবহাওয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা বাড়ে, তাহলে তাপমাত্রাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। আর তাপমাত্রা বাড়াটা যদি শুধু সামনের দিকেই চলে তাহলে মেরু প্রদেশের বরফ যে গলতে শুরু করবে তাতো তোরা আগেই জেনেছিস।

আচ্ছা ছোটকা, কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়া আর একটা কি যেন আমাদের বাতাসকে বিষিয়ে তোলে?

বুড়ি, এককথায় তাকে বলতে পারিস অ্যালার্জির শক্তি। নানাভাবে, নানা আকারে এগুলো বাতাসে মিশে কিছু প্রাণী বা উদ্ভিদের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ওইসব পদার্থে বেশিরভাগ মানুষের কোন প্রতিক্রিয়া না হলেও কেউ কেউ খুবই ভোগেন। যেমন ধর, বাতাসে ফুলের যেমন পরাগ ঘুরে বেড়ায় তার থেকে কারো কারো জ্বর পর্যন্ত হয়। শস্যের দানার যেসব ময়লা তা থেকে হয় এক ধরনের কাশি আর

ফুসফুসের রোগ। তাছাড়াও কার যে কিসে অ্যালার্জি হয় বলা শক্ত, বাতাসের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায় ওইসব অ্যালার্জির বেশির ভাগ কারণ। কাজেই বুঝতে পারছিস, বাতাস যেমন জীবন তেমন বিষাক্ত বাতাস আবার মৃত্যুরও কারণ।

আচ্ছা ছোটকা, অতক্ষণ ধরে তুমি যা বললে তা সবই তো ভয়ের কথা। কিন্তু এই ভয় কাটাবার কি কোন রাস্তা নেই? মানে এই যে নানাভাবে বাতাস বিষিয়ে উঠছে তা থেকে তাকে মুক্ত করার রাস্তা কি আজও বের হয়নি?

দেখ বুবুল, ভয় যেখানে থাকে সেখানে ভয় থেকে মুক্তি পাবার, ভয়কে দূরে সরিয়ে দেবার একটা রাস্তা কিংবা চেষ্টা নিশ্চয়ই থাকে। মানুষের এই ধরনের হঠকারিতার ফলে যেমন বাতাস বিষিয়ে উঠছে, তেমনি সেই বাতাসকে বিষমুক্ত করার চেষ্টাও মানুষই করছে। বিশ্বজুড়ে বাতাস কিংবা গোটা পরিবেশকে মুক্ত করার যে চেষ্টা চলছে তা দেখেই রাষ্ট্রসংঘ ৫ জুন দিনটাকে পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।

ছোটকা, বাতাসকে বিষমুক্ত করার রাস্তাটার কথা কিন্তু তুমি এখনও বললে না?

বলছি শোন। দেখ কলকারখানার চিমনি আর উনুনের ধোঁয়ার সঙ্গে নানা ধরনের মোটরগাড়ির ধোঁয়াই বাতাসকে সবচেয়ে বিষিয়ে তুলছে। তাই দেশে দেশে এগুলোর ওপরই বিজ্ঞানীরা নজর দিচ্ছেন বেশি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, একদিকে জ্বালানির ব্যবহার কমাতে হবে, অন্যদিকে জ্বালানি বদল করতে হবে।

জ্বালানি বদলের কথাটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না ছোটকা।

দেখ বিল্টু, এই বিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি শুধু জীবাশ্ম জ্বালানি।

জীবাশ্ম জ্বালানি কাকে বলে ছোটকা?

জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে। সোজা কথায় বলতে পারিস যে সব জ্বালানি জীবদেহের, তা প্রাণীই হোক আর উদ্ভিদই হোক, রূপান্তরিত অবস্থা তাকেই জীবাশ্ম জ্বালানি বলে। এসব জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সঙ্গে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে।

কিন্তু ছোটকা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির ব্যবহার যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে জ্বালানি হিসেবে আমরা ব্যবহার করব কি ?

প্রশ্নটা শুধু তোকে নয় বুড়ি, ভাবাচ্ছে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের। তাঁরা দেখছেন, জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করলে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইডের মাত্রা অনেক বেড়ে যাচ্ছে। অথচ এরই পাশাপাশি প্রাকৃতিক গ্যাসকে যদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তা থেকে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রায় বেরোয় না বললেই চলে।

কিন্তু ছোটকা, সব কলকারখানা কিংবা মোটরগাড়ি ইত্যাদিতে ব্যবহার করার মত প্রাকৃতিক গ্যাস কি পাওয়া যাবে ?

মুশকিলটা তো সেখানেই হয়েছে মুন্নি। প্রথমত, সবকিছুতে ব্যবহার করার মত প্রাকৃতিক গ্যাস নেই। দ্বিতীয়ত, কয়লা বা পেট্রোলিয়াম যত সহজে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে তত সহজে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাছাড়া কলকারখানাই বল, আর মোটরগাড়িই বল—এখন সেগুলো যেভাবে যে জ্বালানি দিয়ে চালাবার মত করে তৈরি তাকে অন্য জ্বালানি দিয়ে চালাতে গেলে অনেক কিছুই বদলাতে হবে। ফলে আনুষঙ্গিক খরচাটা অনেক বেড়ে যাবে।

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলবে ?

যেমন ধর পেট্রোলচালিত মোটরের বদলে বিদ্যুৎচালিত মোটরগাড়ি ব্যবহারের কথা বলছেন অনেকে। কিন্তু এখন পর্যন্ত যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিদ্যুৎচালিত মোটরগাড়ির ওজনটা বেড়ে যাবে অনেক বেশি। তাছাড়া তার ব্যাটারির দাম যেমন হবে প্রচণ্ড বেশি তেমনি একশ বা বড়জোর দেড়শ মাইল যাওয়ার পরই সে ব্যাটারিকে নতুন করে চার্জ দিতে হবে। এখন ধর নির্জন পথে হঠাৎ যদি ব্যাটারির শক্তি শেষ হয়ে যায় তাহলে কি হাল হবে গাড়ির আরোহীর ? সেখানে সে ব্যাটারির চার্জ করবে কি করে ?

বেশ তোমার কথা মেনে নিয়েই বলছি, মোটরের ক্ষেত্রে এজাতীয় একটা সমস্যা থেকে যাচ্ছে, কিন্তু কলকারখানার ক্ষেত্রে তো সে সমস্যা থাকছে না।

না, তা থাকছে না বুবুল। কিন্তু তাতে উৎপাদন খরচটা অনেকটা বেড়ে যাবে, ফলে জিনিসপত্রের দাম চলে যাবে তোর আমার নাগালের বাইরে।

তাহলে কি আমরা শুধু চুপ করে বসে থাকব ?

তা কেন থাকব। এই ধর না, বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এখন জঞ্জালকে ব্যবহার করার কথা উঠেছে। এটা যদি ঠিক ঠিক কাজে লাগানো যায়, তাহলে একদিকে শহরের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজটাও অনেক সহজ হবে, ওই সঙ্গে বাতাসেও অনেক কম বিষ ছড়াবে।

কি রকম ?

জঞ্জালকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে তা থেকে ধোঁয়া যে বেরোবে তাতে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রায় থাকবে নাই বলা চলে। তাছাড়া জঞ্জাল পাওয়ার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা দেখা দেবে না বললেই চলে। কেননা, তুই, আমি, আমরা প্রত্যেকেই জঞ্জাল জমিয়ে যাচ্ছি শহরে।

একটা সমীক্ষায় দেখা গেছে, নিউইয়র্ক শহরের জঞ্জালকে যদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে নিউইয়র্ক শহরের সারা বছরের বিদ্যুৎ চাহিদার এক চতুর্থাংশের জোগান দেওয়া যায়। কলকাতার জঞ্জাল সম্পর্কেও বিদেশী বিশেষজ্ঞরা একই মন্তব্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন কলকাতার জঞ্জালকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করলে এই শহর একদিকে যেমন ভয়াবহ লোডশেডিংয়ের হাত থেকে বাঁচবে তেমনি কলকাতার বাতাসও অনেকটাই বিষমুক্ত হবে। ওই সঙ্গে এখন ধাপা ইত্যাদির মত যেসব নিচু জলা জায়গায় জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে—সেখানে মাছ চাষও করা যাবে—ফলে শহরের মাছের সমস্যাটাও বেশ কিছুটা কমে যাবে।

তাহলে সেটা করা হচ্ছে না কেন ?

এই কেন-র উত্তর দেওয়া শক্ত। শুধু জেনে রাখ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে ব্রিটেন ছাড়া প্রায় সব জায়গাতেই এখন জঞ্জালকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং তাতে ফলও ভালই পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশেও এখন ব্যাপারটা নিয়ে রীতিমত ভাবনা চিন্তা চলছে।

জীবনের জন্য চাই সবুজ



আচ্ছা ছোটকা, এখন তো মানুষ বাতাসের বিষ নিয়ে এত ভাবছে, আগেও কি তাই ভাবত ?

না বুড়ি।

কেন ?

তার কারণ এই শতাব্দীর আগে পর্যন্ত বাতাস যেমন নানাভাবে দূষিত হত তেমনি প্রাকৃতিক উপায়েই সেই বাতাস আবার শুদ্ধ হয়ে উঠত। কিন্তু এখন একদিকে বাতাস দূষণের মাত্রাটা বেড়ে গেছে অনেক অন্যদিকে যে যে প্রাকৃতিক উপায়ে বাতাস বিষমুক্ত হত সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকেও আমরা নষ্ট করে ফেলছি। তার জন্যই সমস্যাটা এত ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

তাহলে উপায় ?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মূলত তিনভাবে আমরা বাতাসকে দূষণমুক্ত রাখতে পারি।

কি রকম ?

প্রথমত জ্বালানি বদল। এখন যেসব জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করছি তার বিকল্প ব্যবহারের চেষ্টা তো করতেই হবে এমনকি জীবাশ্ম জ্বলানিরও রকমফের ঘটাতে হবে।

সেটা আবার কি ছোটকা ?

দেখতে হবে, জীবাশ্ম জ্বালানিগুলোর মধ্যে কোনটা কম ক্ষতিকারক—সেটাকেই জ্বালানি হিসেবে বেছে নিতে হবে। যেমন ধর, কয়লার চেয়ে জ্বালানি তেলে ধোঁয়া, ঝুল এবং ছাই কম হয় আবার প্রাকৃতিক গ্যাসে তেলের চেয়েও কম ছাই বা ঝুল হয়। তাই যতটা বেশি পারা যায় প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু তুমি তো প্রথমেই বললে, আমাদের সব প্রয়োজন মেটাবার মত ক্ষমতা প্রাকৃতিক গ্যাসের নেই।

হ্যাঁ, তাইতো অন্য বিকল্প'র কথা ভাবতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব প্রযুক্তিগত উন্নতি হয়েছে তার সুফলটাকে কাজে লাগাতে হবে। যেমন ধর, পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ। এক্ষেত্রে অন্যান্য জ্বালানির মত কোন কঠিন কিংবা গ্যাসীয় কোন দূষিত পদার্থ বাতাসকে বিষিয়ে তোলে না। পারমাণবিক তাপ-বিদ্যুতের নিজস্ব ক্ষতি করার যে একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে তাকেও কিন্তু এড়ানো যায় যথেষ্ট সাবধানতা নিলেই।

তাহলে তো পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ তৈরির ওপর জোর দিলেই হয়।

তাতো হয়ই। তবে এক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা এড়াতে বিশেষ ধরনের সতর্কতা নিতে হয়। নাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনাবিলের মত ঘটনা ঘটে যেতে পারে যেকোন মুহূর্তে।

তাহলে উপায় ?

উপায়—যেসব জ্বালানি ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলিই ব্যবহার করা শুধু তার মধ্যে দূষিত করার যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে নষ্ট করে দেওয়া। চিমনি কিংবা মোটরগাড়ির ধোঁয়া বেরিয়ে আসার আগেই তার থেকে কঠিন এবং অবাঞ্ছিত গ্যাসীয় পদার্থ ছেঁকে আলাদা করার কিছু কিছু পদ্ধতি বের করা গেছে। তাতে সুফলও হয়। কিন্তু সে ব্যবস্থাও গৃহস্থালীর কাজে অর্থাৎ উনুনের ধোঁয়া ছাঁকায় বেশ কিছুটা সমস্যা তৈরি করে।

ছোটকা, তুমি দেখছি সব সমাধানের শেষেই একটা বেশ বড় ধরনের সমস্যা জিইয়ে রাখছ। তাহলে কি আমাদের এই পরিবেশ ঠিক রাখার কোন রাস্তাই নেই।

আছে। সেটা হল প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে নষ্ট না করা, খোদার ওপর খোদকারি না করা।

কিন্তু সেটা কি ? তার জন্য কি করতে হবে ?

বলছি। তার আগে দুটো গল্প বলেনি তোদের।

গল্পের নামে হৈ-হৈ করে ওঠে ওরা সবাই। আর একসুরে চারজনেই বলে, কই বল—গল্প বল।

বলছি, বলছি। তোরা শকুন্তলার নাম শুনেছিস ?

হ্যাঁ, দেখেওছি।

দেখেছিস। কোথায়, কোন যুগে দেখলি ?

ছোটকায় চোখমুখের সেই অপরূপ ভঙ্গির দিকে না তাকিয়েই বুড়ি বলে, টিভিতে।

তাই বল। আমি ভাবলাম তুই বুঝি তোর আগের—আগের—আগের জন্মের কথা সব মনে করে রেখেছিস।

ধ্যাৎ কি যে বল না।

বুড়ির প্রতিবাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মুন্নি বলে ছোটকা খালি সব কিছু গুলিয়ে দেয়। শকুন্তলার কি হয়েছে তাই বল।

বলব বলেই তো শুরু করেছি। তোরা তো জানিস, ঋষি বিশ্বামিত্র আর অপ্সরা মেনকার মেয়ে শকুন্তলা থাকত কণ্ব মুনির আশ্রমে। একদিন শকুন্তলা তার সখীদের সঙ্গে খেলছে এমন সময় দেখল তপোবনের পশুপাখি, জন্তুজানোয়ার সবকিছু ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে ; শকুন্তলা ভাবে এমন তো হবার কথা নয়। তপোবনে সবাই তো নির্ভয়ে থাকে—তাহলে এরা ভয় পেল কেন ? একটু পরেই শকুন্তলা দেখে রাজা দুষ্মন্ত তীর ধনুক নিয়ে তাড়া করেছে পশুগুলোর পেছনে। সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলা চিৎকার করে বলে ওঠে, তীর ছুঁড়বেন না, ছুঁড়বেন না—এটা তপোবন। কথাটা শুনেই লজ্জা পেয়ে তীরধনুক নামিয়ে নেয় রাজা। আসলে কি জানিস, সেযুগেও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ঋষিরা তাঁদের আশ্রমের চারপাশে গড়ে তুলতেন তপোবন। সেখানে নির্ভয়ে থাকত সবরকমের পশুপাখি, জন্তুজানোয়ার। সেখানে সব ধরনের গাছপালাকে যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখা হত। ঋষিরা নিজেরাও পরিচর্যা করতেন গাছপালার। অরণ্যষষ্ঠীর সময় সাধারণ মানুষও লাগাত গাছ, পুজো করত তাদের। কেউ কোনরকম ক্ষতি করত না এসবের। বিশেষ করে তপোবনে তো গাছপালা কাটা থেকে জীবজন্তু মারা একদম বারণ। দেশের রাজাও মেনে চলতেন তা। তাই সেযুগে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হতে পারেনি কোনভাবেই।

তাহলে এখন হচ্ছে কেন ?

মানুষের লোভের ফলে। আমরা যত সভ্য হচ্ছি, ততই দেখা দিচ্ছে নতুন নতুন প্রয়োজন—আর তা মেটাতে গিয়েই প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছি।

বিপদের কথা জেনেও মানুষ ব্যবস্থা নেয় না কেন ?

নেবে না কেন। একদল মানুষ যেমন পরিবেশ নষ্ট করার জন্য দোষী ; আরেকদল তেমনি এই পরিবেশকে ঠিক রাখার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে—এমনকি তার জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিচ্ছে।

প্রাণও দিচ্ছে ?

হ্যাঁ। সেই গল্পই এবার বলছি তোদের।

সেটা পাঁচশ বছর আগের কথা। রাজস্থানের মাড়োয়ার রাজ্যের পিপকা নামে একটা গ্রাম। পরপর তিনবছর সেখানে দেখা দিল প্রচণ্ড খরা। ফসল তো প্রায় কিছু হলই না, বরং চারদিকে যেসব সবুজ গাছপালা ছিল—তাও শুকিয়ে গেল।

সেই খরায় গ্রামে দেখা দিল খাদ্যের চেয়েও বেশি জলের অভাব। এক ফোঁটা জলের জন্য মানুষ ছটফট করতে থাকে। সেই সময়ই সেই গ্রামের জাম্বাজি নামে এক সাধক এগিয়ে এলেন মানুষের সেই দুঃখ দূর করার জন্য। তিনি সবাইকে বললেন, দেখ, এই যে প্রচণ্ড খরা—এটা হয়েছে প্রকৃতির অভিশাপে।

এটা তো একটা কুসংস্কার ছোটকা। প্রকৃতির আবার অভিশাপ হবে কি করে ?

সবকিছু ভাল করে না জেনে কোন মন্তব্য করতে নেই বুবুল। সত্যি সত্যি—খরার মূলে রয়েছে প্রকৃতির অভিশাপ।

কি রকম ?

এটা তো তোরা বিজ্ঞানে পড়েছিস, যেখানে গাছপালা বা জঙ্গল বেশি সেখানেই বেশি বৃষ্টি হয়।

হ্যাঁ, সেই জন্যই তো মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়।

ঠিক বলেছিস মুন্নি। তবে এখন চেরাপুঞ্জিতেও আর তেমন বৃষ্টি হয় না, সেখানেও খরা দেখা দিচ্ছে, তা জানিস ?

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যেখানে বনজঙ্গল বেশি, বিশেষ করে পাহাড়ি অঞ্চলে, সেখানকার বাতাস অনেক ঠাণ্ডা হয়, মেঘও সেখানে অনেক বেশি জমে আর তার ফলেই সেসব জায়গায় বৃষ্টি হয় বেশি।

চেরাপুঞ্জি তো এখনও সেই একই জায়গায় আছে, তাহলে এখন সেখানে বৃষ্টি কম হচ্ছে কেন ?

চেরাপুঞ্জি একই জায়গায় আছে একথা ঠিক বুড়ি। কিন্তু সেই একই জায়গার পরিবেশটা যে আর এক নেই।

মানে!

মানে, বেপরোয়াভাবে ওই অঞ্চলের গাছপালা কেটে ফেলার ফলে এখন চেরাপুঞ্জিতে আর আগের মত গাছপালা নেই তাই তেমন মেঘ জমতে পারছে না—বৃষ্টিও হচ্ছে না। এছাড়া গাছপালা কেটে ফেলার ফলে মাটি জল ধরে রাখতে পারছে না বরং জলের তোড়ে একদিকে ভূমিক্ষয় হচ্ছে, অন্যদিকে সমতলে হচ্ছে বন্যা।

তাহলে গাছপালা কেটে কেটে ফেলা হচ্ছে কেন?

তোরা তো জানিস, ওইসব পাহাড়ি এলাকার উপজাতিরা ঝুম চাষ করে।

ঝুম চাষ কি ছোটকা?

ঝুম চাষকে এককথায় বলতে পারিস জমি বদল করে করে চাষ।

তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না?

তবে শোন। আদিবাসীরা সাধারণত একটা জমিতে ২৫।৩০ বছর চাষ করে সেটাকে ফেলে রাখে। তার বদলে অন্য এলাকার জমির বন-জঙ্গল কেটে আবাদ করে। আবার একসময় পুরনো জমির জঙ্গল কেটে শুরু হয় চাষ। কিন্তু এখন মানুষজন বেড়ে যাওয়ায় কোন জমিকেই তারা যেমন তিন চার বছরের বেশি ফেলে রাখতে পারে না, তেমনি নতুন নতুন এলাকার জঙ্গল কেটেও চাষ করে। আর সবকিছু মিলিয়েই বনজঙ্গল কমছে চেরাপুঞ্জিতে। ফলে কমছে বৃষ্টি—দেখা দিচ্ছে খরা।

কিন্তু এর সঙ্গে অভিশাপের কি সম্পর্ক রয়েছে?

গাছপালা কেটে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে বলেই তো বৃষ্টি কম হচ্ছে, গাছ না কাটলে তো এমন হতো না। তাই একে প্রকৃতির অভিশাপ ছাড়া আর কি বলা যায় বল?

ও, অভিশাপ বলতে তুমি তাহলে এই কথা বোঝাতে চাইছ।

ঠিক তাই।

তা, সেই পিপকা গ্রামের খরা নিয়ে কি যেন বলছিলে?

হ্যাঁ, জাম্বাজি সমস্ত গ্রামবাসীকে ডেকে বললেন, তোমাদের পাপের জন্যই প্রকৃতি তোমাদের ওপর রেগে গেছে, তাই এই খরা। এখন

তোমরা যদি কতকগুলি নিয়ম মেনে চল তাহলে প্রকৃতি আর কোনদিন তোমাদের ওপর রাগবে না, আর খরা দেখা দেবে না।

গ্রামবাসীরা, একস্বরে বলে, বলুন কি করতে হবে। বলুন কি আমাদের পাপ ?

তোমাদের পাপ, তোমরা যখন তখন কারণে অকারণে গাছ কেটে এই গ্রাম থেকে সবুজকে একেবারে বিদায় দিয়েছ। গাছপালা নেই বলেই এই গ্রামে এমন খরা নেমে এসেছে ?

গাছ না থাকলে খরা হয়, তাতো আমরা জানি না।

জাম্বাজি বলেন, এই না জানা বা অজ্ঞতা, এটাও একধরনের পাপ। মানুষ যদি অজ্ঞতাকে এড়াতে পারে—তাহলে সে অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট থেকে সহজেই রক্ষা পেতে পারে।

আপনি বলুন, কি করতে হবে আমাদের, আমরা জীবন দিয়েও তা পালন করব।

হ্যাঁ, জীবন দিয়েই তোমাদের পালন করতে হবে। কুড়িটি 'না' তোমাদের মানতে হবে। ওই কুড়িটি নীতি বা বিশ নয় আজ থেকে হোক তোমাদের জীবনের ব্রত।

আমাদের জীবন পণ, আপনার কথা আমরা মানবই। এই প্রচণ্ড খরা আর যাতে না আসে তার ব্যবস্থা শুধু আপনি করে দিন।

বেশ, তাহলে বল, আজ থেকে আর কোন গাছ তোমরা কাটবে না ?

না, কাটব না।

শুধু নিজেরা নয়, অন্যকেও গাছ কাটতে দেবে না। তার জন্য যদি জীবন দিতে হয়, যদি তাদের কুড়ুলের সামনে নিজেকে বলি দিতে হয় তাও করবে।

হ্যাঁ করব।

জাম্বাজির এই রকম বিশটি নয়-কে পিপকা গ্রামের অধিবাসীরা মেনে নিয়ে নতুন করে গ্রামে গাছপালা লাগায়—নিজের ছেলেমেয়ের মত সেগুলির পরিচর্যা করতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যে গ্রাম আবার সবুজ হয়ে ওঠে। খরা দূর হয় চিরতরে। এরপর শুধু পিপকা নয়, আরো মানুষ জাম্বাজির অনুগামী হয়ে ওঠে। জাম্বাজির অনুগামীদের পরিচয় হয় 'বিশ নয়' সম্প্রদায় হিসেবে।

ভারি মজার ব্যাপার তো ? তারপর ?

তারপরের ঘটনা একদিকে যেমন মর্মান্তিক তেমনি বৃক্ষপ্রেম বা গাছের জন্য ভালবাসায় জীবন উৎসর্গ করার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত!

পিপকার ঘটনারই বেশ কিছু পরের ঘটনা। জাম্বাজির 'বিশ নয়' সম্প্রদায়ের আদর্শ তখন ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় গোটা রাজস্থানেই। যোধপুর রাজ্যও তার ব্যতিক্রম নয়। যোধপুরের মহারাজের প্রয়োজনে কাঠুরের দল গেল গাছ কাটতে। কিন্তু বাধা পেল তারা। গ্রামবাসীরা তাদের গাছ কাটতে দিল না।

খবরটা পেয়েই সেনাপতি একেবারে রেগে লাল। এত সাহস সামান্য গ্রামবাসীদের। মহারাজের আদেশ শুনেও তারা গাছ কাটতে বাধা দিয়েছে! এতো রীতিমত রাজদ্রোহিতা। রাজদ্রোহিতার শাস্তি দিতেই এবার কাঠুরেদের সঙ্গে গেল একদল সেনা।

কিন্তু না, সেনা দেখেও ভয় পেল না গ্রামবাসীরা—বরং তারা জোর গলায় বলল, বৃক্ষ আমাদের দেবতা, আমাদের জীবন। সেই জীবনকে বাঁচাতে আমরা জীবন দেব তবু গাছ কাটতে দেব না।

সেনাপতির লাল চোখ যেন ঘুরতে থাকল। গোঁফ মুচড়ে সেনাপতি বলে কাঠুরেদের, কাটো গাছ—দেখি কে বাধা দেয়।

কাঠুরেরা এগিয়ে যায়—তাদের বাধা দিতে এগিয়ে এল গ্রামের মানুষজন। না, অস্ত্র হাতে নয়, এমন কি পুরুষরাও নয়। এল অমৃতা দেবী নামে এক মহিলার নেতৃত্বে গ্রামের মেয়েরা। তারা এক একটি গাছকে জড়িয়ে ধরে বলল, এ গাছ আমাদের জীবন। আমাদের না মেরে এ জীবনকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না তোমরা।

সেনাপতি চড়া গলায় বলে, গাছ ছেড়ে সরে যাও সবাই—নাহলে তোমাদের ওপরই নেমে আসবে কুড়ুলের কোপ।

আসুক, তবু গাছকে ছাড়ব না আমরা।

মহিলাদের সেই সমবেত প্রতিবাদের মুখে সেনাপতি আদেশ দেয় কাঠুরেদের—মারো কোপ। ইতস্ততঃ করে কাঠুরেরা। সেনাপতি অস্ত্র তুলে বলে, তোমরা যদি কুড়ুল না চালাও তবে এই অস্ত্র দিয়ে জীবন নেব তোমাদেরই।

ভয়ে ভয়ে কাঠুরেরা কুড়ুল তোলে—অমৃতাদেবীকে আবারও বলে, সরে যাও—মহারাজের আদেশ, গাছ আমরা কাটবই।

অমৃতাদেবী হেসে বলেন, আমাদের কথা তো বলেই দিয়েছি। আমাদের না মেরে এসব গাছ কাটতে পারবে না তোমরা।

পরম মমতায় গাছকে জড়িয়ে রইলেন অমৃতাদেবী। সেই অবস্থাতেই সেনাপতির আদেশে নেমে এল কুঠার। ক্ষতবিক্ষত অমৃতাদেবীর প্রাণশূন্য দেহটা লুটিয়ে পড়ল গাছের তলায়। হাত দু'টি তাঁর তখনও যেন জড়িয়ে আছে গাছকেই।

অমৃতাদেবী পড়ে যেতেই আরেক মহিলা এসে জড়িয়ে ধরেন গাছ। আবার নামে কুঠার। মারা যান তিনিও। এমনি ভাবে এক দু'জন নয়, প্রাণ দিলেন ৩৬৩ জন। সেই অহিংস অথচ সুদৃঢ় প্রতিবাদের মুখে স্তব্ধ হয়ে গেল শক্তিধর সেনাপতির আস্ফালন। গাছ কাটা বন্ধ রেখে সব খবর তিনি পাঠালেন রাজধানীতে মহারাজের কাছে।

সব শুনে যোধপুরের মহারাজ স্তম্ভিত, অনুতপ্ত। মানুষ তার ধর্ম—তার কথা রাখার জন্য এইভাবে জীবন দিতে পারে এটা তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু 'বিশ নয়' সম্প্রদায়ের এই আত্মত্যাগ তাঁর বিশ্বাসের ভিতটাকেই নড়িয়ে দিল। তিনি আদেশ দিলেন, বন্ধ রাখ গাছ কাটা। এখন থেকে যোধপুর রাজ্যে আর কখনও 'বিশ নয়' সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হবে না। অকারণে আর কাটা হবে না গাছও। শুধু যেসব গাছ মরে গেছে অথবা ভেঙে পড়ে গেছে তার কাঠ দিয়েই চালানো হবে কাজ।

গাছের জন্য সেকালের লোকেরা এমন ভাবে জীবন দিত!

হ্যাঁরে বুবুল। কেননা, মানুষ জানত, বন কেটে বসত বানালে অথবা আবাদ করলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হবে। অযথা খরা কিংবা মরুভূমির শিকার হতে হবে। তবে শুধু সেকালে নয়, এখনও একদল মানুষ গাছকে বাঁচানোর জন্য এমনিভাবেই জীবন পণ করে কাজ করে যাচ্ছেন।

হ্যাঁ, স্কুলে যাবার সময় উল্টোডাঙ্গা ব্রিজের নিচে দেখছি, লেখা আছে, জীবনের জন্য অন্ন, অন্নের জনা বৃক্ষ, বৃক্ষের জন্য বর্ষা, 'বৃক্ষ বাঁচান' এই রকম কিছু কথা।

মুন্নি, তুই ঠিকই দেখেছিস। তবে আমি শহরের এই আন্দোলনের কথা বলছি না। আমি বলছি চিপকো আন্দোলনের কথা।

চিপকো আন্দোলন—কথাটায় কেমন যেন একটা বিদেশী বিদেশী গন্ধ রয়েছে।

মোটেই বিদেশী গন্ধ নেই বুবুল। এটা একেবারে নির্ভেজাল দেশী কথা। আন্দোলনের শুরু ১৯৭৩ সালে। মুনাফালোভী মানুষের



চিপকো আন্দোলন॥ গাছ কাটা রুখতে মেয়েরা জড়িয়ে আছে গাছকে।

হাত থেকে হিমালয়ের গাড়োয়াল এবং অন্যান্য অঞ্চলে গাছপালাকে বাঁচাতে সর্বোদয় নেতা চণ্ডীপ্রসাদ ভট্টর এবং সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে এই চিপকো আন্দোলন। ঠিকাদারের কাঠুরেদের কুড়ুলের হাত থেকে গাছকে বাঁচাতে 'বিশ নয়' সম্প্রদায়ের অমৃতাদেবীর

আদর্শেই গ্রামবাসীরা জড়িয়ে থাকে গাছকে। তাদের একটাই কথা, জীবন এবং জীবিকা রক্ষার উৎস গাছকে তারা কিছুতেই যথেচ্ছভাবে ধ্বংস হতে দেবে না। সৌভাগ্যের কথা বলতে পারিস, তাদের সেই অহিংস প্রতিরোধ কাঠুরেদের কুঠারে এখনও রক্তাক্ত হয়ে ওঠেনি।

আচ্ছা ছোটকা, তোমার কথায় মনে হচ্ছে, কাগজে যেন এই ধরনের কি একটা খবর দেখেছিলাম, কি যেন একটা বাঁধ তৈরি নিয়ে।

তুই ঠিকই দেখছিস বুবুল। উত্তরাখণ্ডে তেহরি নামে এক বিশাল ড্যাম তৈরির পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার। এই ড্যাম তৈরি হলে বহু মানুষকে যেমন উৎখাত হতে হবে, তেমনি বহু অরণ্যভূমিও তলিয়ে যাবে এই ড্যামের জলরাশির তলায়। তাই সুন্দরলাল বহুগুণার নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। জানিস তো, দক্ষিণ ভারতের সাইলেণ্ট ভ্যালিতে এ ধরনের আন্দোলন করে সেখানকার পরিবেশ নষ্ট করে ড্যাম তৈরির পরিকল্পনা নাকচ করতে বাধ্য করা হয়েছে সরকারকে।

কিন্তু ছোটকা, ড্যাম তৈরি হলে তো দেশের আরো ভাল হত। চাষীরা যেমন এতে সেচের জল পেত, তেমনি বন্যার ভয় কমত, জলবিদ্যুতও তৈরি করা যেত, সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাষ ইত্যাদি। একটা জিনিস থেকেই আমরা অনেক সুফল পেতাম। এর চেয়ে কি বনজঙ্গল আমাদের বেশি দরকার ?

একশবার দরকার বুবুল। তোরা গোটাকয়েক হিসেব শুধু জেনে রাখ, এক হেক্টর জমির গাছপালা আমাদের প্রতিদিন ৬০০ থেকে ৬৫০ কেজি অক্সিজেন দিতে পারে। অথচ আমাদের দেশে এখন বছরে গড়ে ১৫ লক্ষ হেক্টর বনভূমি নষ্ট হচ্ছে। তোরা বলবি তাতে তো ভালই হচ্ছে। একদিকে চাষের জমি বাড়ছে ফলে খাদ্যের অভাব দূর হবে, অন্য দিকে সেখানে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠছে, তাতে লোকের থাকার জায়গার অভাব মিটছে।

হ্যাঁ, আমাদের তো তাই মনে হয়।

কিন্তু মুন্নি, ওই বন নষ্ট হওয়ার ফলে আমাদের ক্ষতি কতটা হচ্ছে তার হিসেবটা একবার নিয়ে নে, তারপর যোগ-বিয়োগ করে দেখ কোনটা বেশি দরকার।

বেশ বল, ক্ষতিটা কি হচ্ছে ?

প্রথমত বছরে ভূমির ওপরের স্তর থেকে ১২০০ কোটি টন মাটি ধুয়ে

যাচ্ছে। ১০ থেকে ১৫ কোটি হেক্টর জমি দ্রুত মরুভূমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর প্রতিদিন আমরা বঞ্চিত হচ্ছি ৬ থেকে সাড়ে ৬ হাজার কেজি তাজা অক্সিজেন থেকে!

ওরে বাবা, তাহলে তো ক্ষতিটাই হচ্ছে বেশি।

হ্যাঁ বুড়ি, বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন আমাদের ভারতের মত দেশে সবাইকে যদি সুস্থ, সবল এবং সতেজ রাখতে হয় তাহলে মোট ভূমির ৩৩ শতাংশ বনভূমি দরকার। অথচ যে হারে আমরা গাছপালা কাটছি তাতে ওই হার এখন নেমে দাঁড়িয়েছে ১৪·১ শতাংশে। আর আর তুই যদি পশ্চিমবঙ্গের ছবিটা আলাদা করে দেখিস, তাহলে দেখবি এখানে অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর। এখানে এখন বনভূমির পরিমাণ মাত্র ৭ শতাংশ।

আচ্ছা ছোটকা, তুমি যা বলছ তার থেকে বোঝা যাচ্ছে, বনভূমি আমাদের তাজা অক্সিজেন দেয়, বৃষ্টি বা বন্যার জলে মাটিকে ধুয়ে-মুছে যেতে দেয় না—এই তো?

না মুন্নি, শুধু ওইটুকুই নয়। গাছপালা আমাদের বাতাসকে বিষমুক্ত করে।

কেমন করে?

কেন বুড়ি, ওই যে আগে বললাম, গাছ তার খাবার তৈরির জন্য তেল ঝাল মশলার মত বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড টেনে নেয় এবং ওই সময় অক্সিজেনটা বাতাসে ছেড়ে দেয়। এতে একদিকে যেমন বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভাগ কমে যায়, তেমনি অক্সিজেনের ভাগও বেড়ে যায়।

হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। আর গাছপালা থাকলে একদিকে যেমন বৃষ্টি সরাসরি মাটির ওপর পড়ে তার ওপরের স্তরগুলো ধুয়ে নিয়ে যেতে পারে না তেমনি গাছপালার শেকড় মাটিকে শক্ত করে ধরে রাখে বলে, বৃষ্টির বা বন্যার ঢল মাটিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে না। এছাড়া গাছপালা যে আর্দ্রতা বাড়ায় তাও তোদের বলেছি—ওইসঙ্গে গাছপালা মাটিকে সরস এবং উর্বর রাখে—ফলে ফসল হয় বেশি।

আর কিছু করে না?

হ্যাঁ মুন্নি, আরেকটা উপকারও করে। শুকনো গাছের ডালপালা আমাদের জ্বালানির দরকারটা মেটায়। জানিস তো আমাদের দেশে

বছরে ১৩ কোটি টনের মত জ্বালানি দরকার। এরমধ্যে ৫ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টনের মত জ্বালানি এখানে তৈরি হয়, বাকি প্রায় সব জ্বালানিই জোগাচ্ছে ওই বন।

ছোটকা, তুমি যে হিসেব দিলে তাতে তো এদেশের মানুষকে গাছপালা কাটতেই হবে। আমাদের চাহিদার অর্ধেকের চেয়েও অনেক কম জ্বালানি যখন আমরা তৈরি করি তখন তো এ অবস্থা হবেই।

না বুবুল। এরজন্য আমাদের অন্যরকম ভাবনাচিন্তা করা দরকার।

কি রকম ?

এক বনজঙ্গলের গাছপালা অবাধে না কেটে নিয়ম মেনে মরা শুকনো ডালপালা নিতে হবে! শুধু আমাদের দেশে যে পতিত জমি পড়ে রয়েছে তার থেকে মাত্র এক কোটি কুড়ি লক্ষ হেক্টর জমিতে যদি আমরা জ্বালানি কাঠের জন্য গাছের চাষ করি তাহলে পাওয়া যাবে ৯ কোটি টন জ্বালানি। অর্থাৎ দরকার মিটেও বেশ কিছুটা বাড়তি থাকবে।

আচ্ছা ছোটকা, আমাদের সমস্যা সমাধানের যখন রাস্তা রয়েছে তখন তা কাজে লাগানো হচ্ছে না কেন ?

হচ্ছে না, একথাটা বলা যায় না বুবুল। বিজ্ঞানীরা শুধু এদেশে নয়, সব দেশেই এগুলোকে ভালভাবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন। সরকারও সেইমত ভাবনাচিন্তা করছে। কিন্তু মুশকিল কি জানিস, সাধারণ মানুষকে যদি সহজেই এসব বিকল্প জ্বালানি পেঁছে না দেওয়া যায় তাহলে কাগজে পরিকল্পনা করে কিছুই হবে না। একটা কথা তোদের বলি, প্রতিটি মানুষ যদি সচেতন না হয়, তাহলে এ সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়াটা বড় সহজ নয়। এরজন্য লেখাপড়া জানা মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। প্রতিটি শিক্ষিত মানুষ যদি আর পাঁচজন অশিক্ষিত সাধারণ মানুষকে পরিবেশ কিংবা জ্বালানি ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নেয়—তাহলে খুব সহজেই সমস্যাটা সমাধান করার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে। শিক্ষিত মানুষদের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলেছিলেন, যদি দেশের মানুষ অজ্ঞান বা নিরক্ষর থাকে তাহলে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে বিশ্বাস-ঘাতক বলে চিহ্নিত করতে হবে। কেননা, তারা দায়িত্ব পালন না করার জন্যই অবস্থার রদবদল হয়নি।

বিষ চারিদিকে



আচ্ছা ছোটকা, আমরা প্রায়ই যে পরিবেশ দূষণের কথা শুনি, তা কি শুধুই বাতাস বিষিয়ে ওঠা নিয়ে, না আরো অন্য কিছু আছে ?

বুবুল, তোরা তো জানিস পরিবেশ হল আমাদের এই পৃথিবীর মাটি, জল, গাছপালা, বাতাস, মানুষ, জীবজন্তু, পাখি ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে। এর যে কোন একটি যদি বিষিয়ে ওঠে কিংবা এর কোন একটি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় বা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে সবকিছুরই ওপর। তাই পরিবেশ দূষণ বলতে এর যে কোন একটিকে বিষিয়ে দেওয়া অথবা এর যে কোন একটি অস্তিত্বকে বিপন্ন করা বা হয়ে ওঠাকে বোঝায়।

তুমি তাহলে এগুলো নিয়েও কিছু বল না ছোটকা।

শোন বুড়ি, বাতাস ছাড়া যেমন কোন জীব বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি বেশিদিন জল ছাড়াও কোন জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। তাই সবার আগে আমি জল নিয়ে বলছি।

দেখ, আমাদের এই পৃথিবীর তিনভাগ জল হলেও সেই তিনভাগের প্রায় ৯৯ শতাংশই নোনা জল কিংবা বরফ। পান করার জন্য আমরা পাচ্ছি মাত্র ১ শতাংশ জল। পান করার মিষ্টি জল আমরা পাই নদীনালা, পুকুর এবং মাটির নিচ থেকে। এর সঙ্গে বৃষ্টির জলকেও অবশ্য ধরতে হয়। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়েই খাওয়ার জলও ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

কেমন করে ছোটকা ?

দেখ বুবুল, একদিকে এইসব নদীনালার তীর ধরে গড়ে উঠেছে শহর অন্য দিকে কলকারখানাও গড়ে উঠেছে এই নদীর ধার বরাবর। শহরের যতসব নোংরা জল, কারখানার যত আবর্জনা সবকিছু সরাসরি ফেলে দেওয়া হচ্ছে নদীতে। আর তাতেই বিষিয়ে উঠছে জল।

এছাড়া জমিতে যেসব সার কিংবা কীটনাশক ওষুধ দেওয়া হয় তাও বৃষ্টির জলে ধুয়ে এসে নদীনালা বা পুকুরের জল বিষিয়ে দেয়।

ওইসঙ্গে খনিমুখ কিংবা অন্য জায়গায় জমে থাকা বিষাক্ত বা তেজস্ক্রিয় পদার্থও বৃষ্টির জলে মিশে জলকে বিষিয়ে তোলে। একই ভাবে বাতাসে বিষের পরিমাণ বেশি হলে তাও বৃষ্টির সঙ্গে নিচে নেমে জলকে বিষিয়ে দেয়। আর এইভাবে জল বিষিয়ে ওঠায় একদিকে সেসব জল যেমন মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে উঠছে অন্যদিকে তেমনি জলজ প্রাণী বিশেষ করে মাছের বংশ লোপ পাচ্ছে অথবা বিষজলের মাছ খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

তোরা নিশ্চয় জানিস, গঙ্গা ভারতবাসীর কাছে সবচেয়ে পবিত্র। কিন্তু এখন সেই গঙ্গার চেয়ে বিষাক্ত আর কিছু বোধহয় ভারতবর্ষে নেই।

কেন ছোটকা ?

আগের যেসব কারণ বললাম সেগুলো তো আছেই, তারপর আমরা সবকিছু নোংরা এমনকি আধপোড়া মড়া, মরা জন্তু জানোয়ারের দেহ ইত্যাদি সবকিছু ফেলে গঙ্গাকে বিষিয়ে দিয়েছি। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার জন্য অবশ্য সরকারিস্তরে একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই পরিকল্পনা মত কাজও হচ্ছে, কিন্তু আগে যা বলেছিলাম আমরা নিজেরা সচেতন না হলে গঙ্গার গঙ্গাযাত্রার আর খুব দেরি হবে না।

আর শুধু গঙ্গার কথাই বা বলি কেন, পৃথিবীর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ডালহ্রদ, তাও আজ বিষে ভরা।

কিন্তু এর থেকে রেহাই পাবার কি কোন রাস্তা নেই ?

থাকবে না কেন ? প্রথমত, নদীর ধারে যেসব কলকারখানা রয়েছে তাদের ময়লা নদীতে ফেলার আগে তাকে বিষমুক্ত করে নিতে হবে। শহরের নোংরা জলের ক্ষেত্রেও একই কথা। তার ওপর নদীতে জন্তু-জানোয়ার অথবা শব ফেলা যেমন বন্ধ করতে হবে তেমনি বিশেষ ধরনের কচ্ছপের মত যেসব জলজ প্রাণী মাংস খায় তাদের বংশবৃদ্ধির দিকে এবং নদীর বহতা যাতে ঠিক থাকে তার ওপর নজর দিতে হবে।

সমুদ্রের জল কিভাবে বিষিয়ে ওঠে ?

সমুদ্রে যেসব নদী এসে মিশেছে তারা যেমন নোংরা বয়ে আনে তেমনি জাহাজগুলিও প্রতিদিন রাশি রাশি নোংরা ছড়িয়ে দিচ্ছে সাগরে।

কি রকম ?

তাহলে কিছুদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি শোন। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস। ইংলণ্ড থেকে মাইল আটেক দূরে ঘটল ঘটনাটা।

টোরি ক্যানিয়ন নামে একটা মালবাহী জাহাজ কুয়েত থেকে তেল নিয়ে আসছিল ওয়েলসে। ৬১,২৬৩ টনের এই জাহাজটা সেভেন স্টোন রিফে হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে গেল ফেঁসে। তেল বেরিয়ে আসতে থাকল জাহাজটা থেকে। প্রায় সাড়ে ছ'শ ফুট লম্বা একটা তেলের স্তর ভেসে আসতে থাকল উপকূলের দিকে। সেই তেলের স্তরকে নষ্ট করার জন্য ৩৬টি জাহাজকে পাঠান হল ডিটারজেন্ট পাউডার ছড়াবার জন্য। ছোট ছোট নৌকোগুলো কূলের দিকে পাউডার ছড়াতে থাকল। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দু হাজার জওয়ান এবং অসামরিক লোকজন কাজে নেমে পড়েও তেলের স্তরকে হঠাতে পারল না। দশ দিনের মাথায় তেলবাহী জাহাজটা দুটুকরো হয়ে যাওয়ায় সমস্ত তেল সমুদ্রে পড়ে বিরাট এলাকা জুড়ে সরের মত ভাসতে থাকল। সেই তেলের স্তরে আটকে মরতে থাকল হাজার হাজার পাখি, সমুদ্রের মাছ, শুক্তি ইত্যাদি জলজ প্রাণী। অবস্থা সামাল দিতে রয়েল এয়ার ফোর্সের জেট বিমান থেকে ওই ট্যাঙ্কারে বোমা ফেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। সেই আগুন যাতে নিভে না যায় তার জন্য তার ওপর বিমান থেকে তেল ঢালা হতে থাকে।

ওদিকে ফ্রান্সে যাতে ওই তেলের স্তর না আসতে পারে তার জন্য সেখানেও নানা ব্যবস্থা নেওয়া হতে থাকল। আর এই জাহাজ ভাঙার ফলে কোটি কোটি টাকার তেল নষ্ট হওয়া ছাড়া ব্রিটিশ এবং ফরাসি সরকারকে খরচ করতে হল আরো কোটি কোটি টাকা। নষ্ট হয়ে গেল ১২০ মাইল দীর্ঘ ইংলন্ডের সুন্দর উপকূল অঞ্চল, মারা গেল হাজার হাজার পাখি, মাছ, শুক্তি।

এটাতো হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা।

সাগরে এমন ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটে। তাছাড়া জাহাজ ধোয়া, কিংবা জাহাজ থেকে নানা আবর্জনা ফেলা, সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাওয়া জাহাজ ইত্যাদিও সমুদ্রের জলকে বিষিয়ে দেয় আর সেই বিষিয়ে যাওয়া জল তার তীরে তীরে গড়ে ওঠা শহরগুলির জীবনকে বিপন্ন করে তোলে। শুধু বাতাস বা জল নয়, শব্দ দূষণও আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে।

শব্দ দূষণ কি ছোটকা ?

আমাদের যে শ্রবণ যন্ত্র বা কান, তার শোনার একটা ক্ষমতা আছে।

স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যত তীক্ষ্ণ আওয়াজ সহ্য করতে পারি তার মাত্রাটা যখন ছাড়িয়ে যায় তখনই আমাদের শ্রবণ যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। এখন সারা পৃথিবীতেই স্বাভাবিক শব্দের চেয়ে অস্বাভাবিক শব্দের মাত্রা বেড়ে গেছে। রেডিও, স্টিরিও, লাউডস্পিকার, কলকারখানা, বাড়ি ঘর তৈরি, বিমান, মোটরযান, রেলগাড়ি এমন কি অশান্ত জনতা সবাই শব্দের মাত্রাকে বাড়িয়ে চলেছে। আর এতেই ব্যাহত হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক জীবন, অনেকে কালা পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এ কারণেই আমাদের দেশ সমেত পৃথিবীর নানা দেশেই শব্দ দূষণ রোধে আইন করা হয়েছে। কিন্তু এটা তো সত্যি, শুধু আইন করে সব সমস্যার সমাধান করা যায় না। সবার আগে আমাদের নিজেদের বোঝা দরকার, আমরা অনেক সময় না বুঝে যেসব কাজ করি তাতে অন্যের ক্ষতি হতে পারে। এটা যদি মানুষকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু সহজেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কিন্তু ছোটকা, তুমি যা বললে, মানে আমাদের সমস্ত পরিবেশটাই যেভাবে বিষিয়ে যাচ্ছে তাতে কি আর আমরা সচেতন হবার কিংবা অন্যকে সচেতন করার সময় পাবো ?

না রে, অত হতাশ হবার কিছু নেই। দেরি যে হয়নি তা নয়, তবে এখনও সময় আছে। এখন থেকে আর সবার সঙ্গে তোরা মানে তোদের বয়সী যেসব কিশোর কিশোরী আছে তারা যদি হাত মেলায়—তাহলে পৃথিবীটা আবার আগের মতই সবুজ হয়ে উঠবে—আবার বইবে বিশুদ্ধ বাতাস। তোদের ঘিরেই আজ চারিদিকে সবুজের স্বপ্ন। তোরাই পারিস এই পৃথিবীটাকে বাঁচাতে।

একটা প্রচণ্ড আবেগে ছোটকা হঠাৎই ওদের জড়িয়ে ধরে। ওরা তাকিয়ে থাকে ছোটকার মুখের দিকে। ওদের মনে মনে তখন ঝলসে ওঠে শপথ—এ পৃথিবীকে আমরা সবার বাসের উপযোগী করে তুলবোই—তুলব।

———